পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য

সম্পাদনা

সরদার ফজলুল করিম

অধ্যক্ষ, সংস্কৃতি বিভাগ, বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা

ক বি তা

প্রসংগ কথা

পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমীকে পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের ভূমিকার দিকটি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একখানি সংকলন তৈরীর জন্য একটি বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করেন। বর্তমান সংকলনখানি উল্লিখিত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংকলনখানিকে আমরা প্রবন্ধ, আলোচনা এবং কবিতা হিসাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম ভাগের প্রথম দুটো রচনায় পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমি এবং সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ রচনা দুটো পাকিস্তানোত্তর কালের। কিন্তু অপর রচনাগুলো পাকিস্তান পূর্বকালে পাকিস্তান আন্দোলনের বিষয়ে রচিত এবং প্রকাশিত। পুরাতন পত্রিকাদি থেকে এ সমস্ত রচনা সংকলন করা হয়েছে। সাহিত্যে পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এ দুটো সংগঠনই পাকিস্তান আন্দোলনের যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। আলোচনা পর্যায়ে উপরোক্ত সংগঠন দুটোর গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ ও বিবৃতিসমূহ সংকলিত হয়েছে। কবিতাংশে পাকিস্তানের উপর রচিত সে যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা ও গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের ভূমিকার উপর এ পর্যন্ত কোন সংকলন-গ্রন্থ তৈরী হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। যে সমস্ত তথ্য ও আলোচনামূলক রচনা, ভাষণ ও বিবৃতি বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হল তাতে সংকলনখানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে, এই আমাদের বিশ্বাস। সংকলিত রচনার কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আজ জীবিত নাই আমাদের সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে তাদের আমরা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি।

২৩শে মার্চ, ১৯৬৮।
ঢাকা

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক, বাংলা একাডেমী

প্রবন্ধ

পাকিস্তানের সৃষ্টি

ভূমিকা

পাকিস্তানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে গোড়াতেই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দশটা দেশের মতো পাকিস্তানের একটি সাধারণ ইতিহাস আছে সত্য এবং আরো দশটা দেশের আজাদী সংগ্রামের সাথে পাকিস্তানের আজাদী সংগ্রামের তুলনাও হতে পারে। এদিক থেকে আর সকল দেশের সাথে পাকিস্তানের পরিচিতি অল্পবিস্তর এক। কিন্তু এখানে ইতি টানলে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবটুকু বলা হয় না—তার আজাদী আন্দোলনের সকল কথাও বলা হয় না। কারণ, পাকিস্তানের ইতিহাস অনন্যসাধারণ এবং পাকিস্তানের আজাদীর সংগ্রামের কথা বিচিত্র।

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান হঠাৎ 'আলোর ঝলকানির' মতই পৃথিবীর বহু দেশের বিস্মিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যায় এবং নূতন একটি দেশের বিচিত্র সীমারেখার মাধ্যমে তা হয় চিহ্নিত। পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝখানে আর একটি দেশের স্বাধীন অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষিত হয়। এ উপমহাদেশের এতদিন নাম ছিল ভারত। স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল প্রথম প্রভাত থেকেই তাদের নাম হয় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান (ভারত)।

নূতন হলেও পুরাতন

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে যদিও পাকিস্তানের যাত্রা শুরু কিন্তু ১৯৪০ সনের আগে পাকিস্তানের কোন স্পষ্ট ধ্যানধারণা কারো মনে ছিল না। ১৯৪০ সনের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই পাকিস্তান পরিকল্পিত হয়েছিল। অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু মুসলমান এলাকা নিয়েই এই নূতন আবাসভূমির দাবী উত্থিত হয়। ১৯৩০ সনের আগে পাকিস্তানের মত একটি স্বতন্ত্র মুসলমানের দেশের কথা নীহারিকা লোকের কুয়াসার মধ্যে কোথাও যে উঁকিঝুঁকি দেয় নাই, সে কথা আমরা

বলব না। তবে ১৯৩০ সনে মহাকবি ইক্‌বাল এরূপ একটি স্বপ্ন সাধের ইশারায় মুসলমানকে ডাক দিয়েছিলেন মাত্র। তাই বলা যায়, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা বহু দেশের মানুষকে বিস্ময় চকিত করে দিল। কারণ, এর আগে পাকিস্তান একটি দেশ এবং পাকিস্তানীরা একটি জাতি—এ কথা অনেকেরই ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

কিন্তু পাকিস্তান এদিক থেকে নবাগত হলেও তার ইতিহাস স্মরণাতীত কালের কোন সুদূর অধ্যায়ের উৎস থেকে যাত্রারম্ভ করেছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে একথা আমরা আজ ভাল করেই জানতে পেরেছি যে, এ-উপমহাদেশের মাটিতে যখন সভ্যতার পত্তন হয়, তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বর্বরতার যুগ নীরন্ধ্র হয়ে বাসা বেঁধে আছে। হাযার হাযার বছর পূর্বেও এ-উপমহাদেশে আজিকার পাকিস্তান বলে চিহ্নিত একালায় সুসভ্য মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। মহেনজোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থান তার সাক্ষী। এ অঞ্চলে দ্রাবিঢ় সভ্যতা এ-উপমহাদেশের সবচাইতে প্রাচীনতম সভ্যতা। মার্টিমার হুইলার খ্রীস্ট-পূর্ব ৫000 বছরের পাকিস্তান বলতে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন। তারপর বাইরের কত জানা ও অজানা সভ্যতার ধারা এসে এখানে মিলিত হয়েছে তার লেখাজোকা নাই। দ্রাবিঢ় সভ্যতার সাথে স্মরণাতীত এবং স্মরণ কালের ইতিহাসে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাই বা অনুমান করে নিতে পারি। পাকিস্তানের দুই এলাকার সাথে দ্রাবিঢ় সভ্যতার যোগাযোগ নিবিড়। এজন্যই মার্টিমার হুইলার বলেছেন, আশ্চর্যের কথা এই যে দূর-অতীতেই যে এ-উপমহাদেশে পাকিস্তানের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমি এভাবে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রাবিঢ়রা ঘর বেঁধেছিল এবং দোসর খুঁজেছিল ও এক নূতন সভ্যতার পত্তন করেছিল, এসবের বিস্তারিত ইতিহাস জানা গিয়েছে। দাক্ষিণাত্য ও মাদ্রাজের উপকূল ধরে ধরে দ্রাবিঢ়রা পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রবেশ করে; তাও ভালভাবে প্রমাণিত হচেছ। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্রাবিঢ় সভ্যতার ধারা এসে পাকিস্তানের দুই অংশে সুদূর অতীত থেকেই মিলিত হয়েছিল। এ-উপমহাদেশের ইতিহাস-স্বীকৃত যে কোন বড় সভ্যতার পাকিস্তানের এ সভ্যতাকে প্রাচীনতম বলে পাকিস্তানীরা একমত। তাই বলা যায়, পাকিস্তান নূতন হলেও প্রাচীন।

দুই হয়েও এক

পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মিল নাই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ভিতর এক হাযার মাইলেরও বেশী ব্যবধান রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আবহাওয়া, জবান ও জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সব অংশই একান্তভাবে মওসুমী এলাকায় অবস্থিত। এখানে নদ-নদী, খাল-বিল-হাওর ও জলাভূমির অন্ত নাই। পশ্চিম পাকিস্তান অত্যন্ত গরম ও অত্যন্ত শীতের এলাকা। তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মরুভূমি রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বহু স্থান শীতের সময় বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু, সিন্ধী, বেলুচ প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা প্রচলিত। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা সাধারণতঃ বাংলা বলে। মাছ-ভাত পাক-বাংলার প্রধান খাদ্য আর পশ্চিম পাকিস্তানে গোশ্‌ত-রুটির চলনই বেশী। এসব ব্যবধানের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায় এবং পরিষ্কার করে তোলাও যায় যে মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট—তারা নানা দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত।

কিন্তু এসব ব্যবধান সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামগ্রিক ঐক্যের বুনিয়াদ যে প্রশস্ত ও শক্তিশালী নয়, তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য আছে—তারা দুই হয়েও এক। প্রথমতঃ পাকিস্তানের বাশিন্দাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই হল মুসলমান। ধর্মের এ অভিন্নতাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে আদর্শবাদের জন্ম হয়, তারই অন্তঃসলিলা ভাবধারা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকে ঐক্যের অবিভাজ্য বন্ধনে বেঁধেছে। পাকিস্তান আন্দোলন এজন্যই কেবল একটি সাধারণ দেশমুক্তির আন্দোলন ছিল না। তার ভৌগোলিক এলাকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায় নাই। পাকিস্তান শুধু একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন নয়। পাকিস্তান একটি জীবনাদর্শ ও ইসলাম-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার নবরূপায়ণের আন্দোলন। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর তার যাত্রা শুরু হয়েছে। আদর্শের পথে পাকিস্তান সুদূরের যাত্রী। সমস্যা-পীড়িত দুনিয়ার মানুষের জন্য নূতন আশা জাগ্রত করতে চায় পাকিস্তান। স্ব-সমাজ ও স্বদেশের নব বিন্যাসের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রথম দফায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়। তারপর বিশ্বসভায় মর্যাদাবান

আসন প্রদান করতে চায় এবং তারপর হতে চায় সারা বিশ্বের দিসারী। পাকিস্তানী জাতীয়তা আদর্শ-ভিত্তিক। এ আদর্শের দুর্জয় বন্ধন তাকে এক করেছে ও সংহত করেছে।

অন্য আরও একটি বন্ধনও পাকিস্তানকে ঐক্যাভিসারী করে রেখেছে। তা হল তার ঐতিহ্য, ইতিহাস, তাহজীব ও তমদ্দুন। এক ঐতিহাসিক অতীতকে সকল পাকিস্তানী সমানভাবে ভালবাসে। তাদের একই ইতিহাসের সুখ ও দুঃখের স্মৃতি সর্বত্র তাদের আনন্দ জাগায়, উৎসাহিত করে, বিহ্বল করে ও কাতর করে। আরবদের সিন্ধু বিজয়, পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, মোগল-পাঠান কীর্তি এবং তাদের জয়-পরাজয়, পতন ও উত্থান সমানভাবে সকল পাকিস্তানীর প্রাণে উল্লাস জাগায় ও বিচলিত করে। স্মৃতির মৃত্যুহীন উত্তরাধিকারের বদৌলতে সকল পাকিস্তানী একত্রে অনুভব করে যে, তারা অভিন্ন ও এক।

পূর্ব পাকিস্তানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের শিল্পকর্মের ধারায় একই ঐতিহ্য-ইতিহাসের সুর এসে যে মিলিত হয়েছিল এবং সে সুর যে আজো জীবন্ত, প্রতিধ্বনিময় ও প্রবহমান তার প্রমাণের অভাব নাই। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও হাদিসের জবান আরবী। আরবীর প্রভাব ফারসী ভাষাভাষী বহু রাজ্যে পড়েছিল এবং ফারসীও তারই মত তুর্কী প্রভৃতি ভাষারও রঙ্ বদলে যায়। ইস্‌লামী মূল্যবোধ যেমন তওহিদ, আখওয়াত, ইনসাফ, সাম্য প্রভৃতি গুরুত্ব অর্জন করে। আরব অভিযাত্রী ও শাসকেরা, পাঠান, তুর্কী ও মোগল বিজয়ী, শাসক ও রাজাবাদশারা আরবী, ফারসী ও তুর্কী সাহিত্য এদেশে নিয়ে এলেন। ভারতীয় ভাষায় পরিবর্তন এল, বিপ্লব সাধিত হল, তার রঙ ও সম্পদ বিচিত্র হয়ে উঠল, এমন কি—নূতন জবান ও বুলির জন্ম হল এবং উপেক্ষিত ভাষাগুলি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল। তাদের ভিতর নূতন করে জীবন-যৌবনের জোয়ার এল। উর্দুর জন্ম, হিন্দীর রূপায়ণ, বাংলার উন্নতি ও স্বীকৃতির কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। উর্দু ও বাংলা পাকিস্তানের দুটি রাষ্ট্র ভাষা। আরবী, ফারসীর প্রভাবে এ-দুটি ভাষা ধন্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। উর্দু ও পাক-বাংলার সুরে, রূপে ও পরিচয়ে ইসলামী ভাবধারার বন্ধনের মধ্যে পাকিস্তানের ঐক্যবন্ধনও সুনিবিড় হয়ে ধরা পড়েছে। সুকুমার শিল্পের অন্যান্য শাখায়, চিত্রে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে এবং জীবনের ও প্রত্যহের

হাযার হাযার আচার-আচরণে, চাল-চলনে, তাহ্‌জীব-তমদ্দুনে সকল পাকিস্তানী তাদের স্বধর্ম ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। বৈচিত্র্যের ভিতর এই ঐক্য পাকিস্তানী জাতীয়তার স্থায়ী ভিত রচনা করেছে।

দুই অঞ্চলের পাকিস্তানীদের ঐক্যের সূত্র ইতস্ততঃ আরো অনেক কিছুর ভিতর ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল নদ-নদী-প্রধান। অসংখ্য নদী এখানে রয়েছে। গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে বিখ্যাত। কিন্তু এগুলি ছাড়াও এখানে আরো শত শত নদ-নদী, খাল, নালা রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে নদ-নদী অল্প কিন্তু তারও মূল প্রাণধারা সিন্ধু নদ। দুই দেশের সমুদ্রোপকূল বিশাল। বড় বড় জনপদ, নগর-বন্দর নদ-নদীর পথ ধরেই গড়ে উঠেছে। উভয় অংশের গ্রামাঞ্চল উর্বর ও কৃষি প্রধান উপজীবিকা। এগুলিও পাকিস্তানীদের জীবন যাত্রায় অলক্ষ্যে ঐক্যের সূত্র রচনা করে রেখেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস ও ভূগোল তাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে, এদেশের সীমাহীন বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েও সীমাহীন ঐক্যের বন্ধন আছে। এ প্রসঙ্গে আমরা জানতে পেয়েছি পাকিস্তানের ইতিহাস এক দিক থেকে যেমন ২০ বছরের কিন্তু অপর দিক থেকে তার সভ্যতার ইতিহাস হাযার হাযার বছরের। পাকিস্তান নূতন হয়েও পুরাতন। তার ইতিহাস-ঐতিহ্য, তার তাহজীব-তমদ্দুনের ভিতর আরো একটি সত্য মুখর হয়ে আছে যে, পাকিস্তান দুই হয়েও এক, একতাবদ্ধ ও অবিভাজ্য।

ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমি

এ উপমহাদেশের পাকিস্তান-পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে দুই-একটি কথায় বর্ণিত হতে পারে। প্রথমে মুসলমান এখানে আসে অভিযাত্রীরূপে, দ্বিতীয়বার তাদের দেখি 'রণধারাবাহী, জয়গানগাহী' বিজয়ীর বেশে। তারপর দিল্লীর তখ্‌তে সুলতান রূপে দেখি মুসলমানের প্রতিষ্ঠা। এভাবে শাসক-সম্রাটরূপে তাঁরা শত শত বছর রাজত্ব করেছেন। অবশেষে একদিন এল পতনের যুগ। এ-উপমহাদেশের রঙ্গমঞ্চে এল সমুদ্র পথে বিদেশী বণিকের দল। বণিকের মানদণ্ড রাত্রিশেষে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। মুসলমান হল শাসিত। শাসন ও শোষণের দুর্বিষহ দিনের সমাপ্তি টেনে একদিন বিদেশী শাসনের অবসান ঘটল। এ-উপমহাদেশের সেই বিদেশী

সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের নব-সৃষ্টির যে পত্তন হল তারই এক খণ্ডিত অংশে জেগে উঠল মুসলমানের নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার দেশ পাকিস্তান।

৭১১ সনে মুহম্মদ বিন্-কাসিমের সিন্ধু অভিযানের পূর্বেও পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে মুসলমানের যোগাযোগ যে এখানে-সেখানে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধুতে, দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে ও চাটগাঁও-এ আরব বণিক সওদাগর ও মিশনারীরা ব্যবসায় ও ধর্ম প্রচারের তাগিদে এর আগেও এসেছিলেন। যা'হোক সিন্ধুতেই প্রথম আরব অভিযান সফল হয়। ৭১৩ সনে মুলতান আরবদের দখলে যায়। তারও ২৫০ বৎসর পর উত্তর ভারতে গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ ও মোহাম্মদ ঘোরীর আক্রমণ ও অভিযান শুরু হয়। ১২০৬ সনে কুতুবুদ্দীন দিল্লীর তখ্‌তে আরোহণ করেন এবং তিনি ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান। ১২২১ খ্রীস্টাব্দে চেঙ্গীজ খাঁ এ উপমহাদেশে হানা দেন এবং ১৫২৬ সনে বাবরের নিকট পাঠান সুলতান পরাজয় বরণ করেন ও এভাবেই মোগল শাসন এদেশে কায়েম হয়। এ বংশের বাবর থেকে আরম্ভ করে হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান এবং আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। আওরঙ্গজেবের পর এ বংশে তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ সময় ইউরোপের কয়েকটি বণিকদল এ মহাদেশের ভাগ্যমঞ্চে উদিত হয়। বাণিজ্য করার সাথে সাথে ভাগ্যচক্রে তারা হয়ে উঠে শাসক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন ১৭৫৭ সনে পলাশীর আম্রকাননে। নামেমাত্র তখন দিল্লীর তখ্‌তে মোগল সম্রাটরা রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। কোম্পানীর জবরদস্তী চরমে উঠে আস্তে আস্তে মারাঠা, রাজপুত, শিখদের অভ্যুত্থান ও অগ্রগতির উপরও ইংরাজদের আঘাত নেমে আসে। শিক্ষা ও তমদ্দুনের উপর হামলা চলে। ফারসী ভাষার স্থান দখল করে ইংরাজী। মুসলমানদের জমিদারী-জায়গীরদারীর হাত-বদল হয়। অনুগত হিন্দদের উপর ইংরাজদের অনুকম্পার বেশীর ভাগ যেমন বর্ষিত হয়, তেমনই সাক্ষাৎ সঙ্ঘাত ও মোকাবেলার পাত্র হিসাবে মুসলমানদের উপর নেমে আসে জোর জুলুম ও নির্যাতনের প্লাবন। ১০০ বছর পরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৮৫৭ সনে ওহাবী বিদ্রোহের পরে (১৮২৬-১৮২৯) আসে সিপাহী বিদ্রোহ ও আজাদীর লড়াই।

ইংরাজরা যখন 'বিদ্রোহ' দমন করল, তখন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বার্মায় নির্বাসিত হন। কোম্পানীর রাজত্বও খতম হয় এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া এ উপমহাদেশের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হন। অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলতে থাকে মিলিত জাতীয়তা গঠনের টানা-পোড়েনও শুরু হয়ে যায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে নিয়ে অখণ্ড ভারতকে একপ্রাণ, একদেহ ও একতার আয়োজন হয়। কিন্তু মিল না হয়ে ঐতিহাসিক কারণে গোঁজামিলই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সর্বশেষে পাকিস্তান ও ভারতের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আজাদী আসে।

সিন্ধু বিজয় থেকে বাহাদুর শাহের নির্বাসন এবং পলাশী থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত এ উপমহাদেশের ভিতর মুসলমানের ইতিহাস চিত্র-বিচিত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এর মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে একটি তথ্য। তা'হল মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য। এ উপমহাদেশে মুসলমানের আগে বহু জাতি এসেছে। কিন্তু আর সকলেই এই ভারতের মহা-মানবের সাগরে একদেহে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানের আগমনেই— বিবাদ বাঁধল। কারণ, মুসলমানেরা যে সভ্যতা ও তমদ্দন নিয়ে এখানে এল তার সাথে ভারতীয় সভ্যতার ব্যবধান ছিল আসমান-জমিনের। মুসলমান তওহিদপন্থী, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। প্রতিবেশী হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবী, প্রতীকপূজা ও প্রতিমা উপাসনার ব্যাপার রয়েছে। হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রম আছে; ফলে বহু স্থানে হিন্দু ইসলাম কবুল করল বটে, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমানের ভিতর সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল। এ সমন্বয়ের চেষ্টা নানাভাবে হয়েছে। নূতন ধর্ম প্রচার করে, কবীর, নানক প্রমুখ অনেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা করে গেছেন। কিন্তু তা সার্থক হয় নাই। বড়জোর বহু-ধর্মের দেশে ধর্মতালিকাকে এভাবে কেবল সমপ্রসারিত করা ছাড়া এতে আসল কোন ফায়দা হয় নাই। সম্রাট আকবর দীন-এলাহীর মাধ্যমেও একই চেষ্টা করতে যেয়ে বাধা পেয়েছিলেন। মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানির প্রতিবাদের কণ্ঠকে 'শাহান-শাহ্ জাল্লেজালালুহু জালালুদ্দীন' আকবর পর্যন্ত স্তব্ধ করতে পারেন নাই। আকবরের দেখাদেখি ইসলামের যে শৈথিল্য দেখা দেয়, আওরঙ্গজেব তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সকল ধর্মীয় শিথিলতা ঝেড়ে ফেলে কোরান সুন্নার

এবং হানাফী ভাবধারাকে তিনি উজ্জীবিত করেন। এমন করে মুসলমান আমলে মুসলিম ও হিন্দু ভাবধারার মিতালী আন্দোলন বার বার ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতে সমন্বিত ধর্ম ও মিলিত জাতীয়তার আদর্শ বা রূপ কোনটিই দানা বাঁধে নাই।

মুসলমান শাসক ও হিন্দু শাসিতের সহ-অবস্থানের দিনগুলি সব সময় শান্তিপূর্ণ ছিল না। হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে মুসলমানের এবং মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দুর বাধাদান যেমন পূজা-কোরবানীতে, তখনও সংঘাত, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ইংরাজের উস্কানিজাত ব্যাপার বলে যাঁরা মনে করেন এবং ব্রিটিশ আমলের পূর্বে তা ছিল না বলে যাঁরা ভাবেন তাঁরা ভুল করেন। সে সময়কার ও পরবর্তী প্রামাণ্য ইতিহাসে পর্যন্ত তার উল্লেখ আছে। (যেমন 'সায়েরে মুতাক্ষারিন', কাজী আবদুল ওদুদের 'মুসলমানের পরিচয়')। তবে একথা ঠিক, তার অনুসৃত ভেদ-নীতির পরবর্তী স্তরে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ইংরাজ ইন্ধন হয়তো অনেকবার যোগিয়েছে। ফলে, আগুনের মাঝে তুফান এসে মিলিত হয়েছে। দাঙ্গার ভয়াবহতা তখন বেড়ে গেছে।

কালের চক্রের এমনই ঘোর যে, একটি জাতিকে যখন তার ভাগ্যবিধাতা তৈরী করেন, তখন তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে গড়ে-পিটেই সংহত করে তৈরী করেন। ইংরাজের ও মুসলমানের ভিতর তমদ্দুনগত একটা মিল আছে। ঈসাকে নবী হিসাবে মুসলমান শ্রদ্ধা করে। বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টকে মুসলমান মানে। কিন্তু খ্রীস্টান ইংরাজ সওদাগর যেদিন এসে এদেশে—মিজান ফেলে তলোয়ার হাতে নিল, তখন তার ক্রুসেডের ঐতিহ্য জেগে উঠল। ক্রুসেডের বিষে মন তার ভরা। তার সাথে ভারতের মুসলমান সম্রাট, নওয়াব ও শাসকদের সাথেই সংঘর্ষ বাঁধল। মুসলমান তার দুশমন ভূমিকায়। মুসলমানের সাথে লড়তে হলে বিদেশ-বিঘরে আর জনের সহায়তা তার কাম্য ও প্রয়োজন ছিল। মুসলমানের শাসনাধীনে থাকার ধারণায় পীড়িত হিন্দুর কাছে তা মনে হল গনিমৎ। হিন্দুরা খ্রীস্টান ইংরাজকে শুধু প্রভু পরিবর্তনের মনোভাব নিয়ে নয়—ত্রাতারূপে গ্রহণ করল। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহা অশুভ আঁতাত বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু ইহাই ছিল সেদিন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইংরাজ ঐতিহাসিক ও ইংরাজী নবিস হিন্দুর যোগ-

সাজসে এ উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌রা যবন, ম্লেচ্ছ, জালেম, নারীনির্যাতনকারী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হলেন। টডের History of Rajasthan বাংলায় হলো 'আর্যকীর্তি', বঙ্কিম, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে বা রঙ্গলালের কবিতায় রাজপুত মারাঠার তুলনায় মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌রা হীনবীর্য, চরিত্রহীন লম্পট রূপে অঙ্কিত হলেন, এ আবহাওয়ারই-প্রভাবে।

ইংরাজরা রাজভাষা ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজীর প্রবর্তন করল (১৮১৫ সনে)। মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েই নব শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারী হস্ত থামল না, মুসলমানের মুখের গ্রাসও কেড়ে নেওয়া হল। নূতন নূতন আইন জারি হতে লাগল। সূর্যাস্ত আইন (Sunset law ১৪ সন) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: Permanent Settlement. লাখেরাজ বাজেয়াফ্‌তি আইনের (Resumption Proceedings) ফলে মুসলমান ফতুর হল, পথের ফকীর বনল। এখানে হান্টারের কয়েকটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। হান্টার বলেছেন, 'The Mussalmans became Hewers of wood and Drawers of water—মুসলমান কাঠের রং মিস্ত্রী ও পানির ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হয়ে গেল।' হান্টার বলেছেন, 'The Permanent Settlement... most seriously damages the position of great Muhammedan houses. For the whole tendency of the settlement was to acknowledge as land-holders. The subordinate Hindu officers who dealt directly with husbandmen'—

[অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিখ্যাত মুসলমান পরিবারগুলির মর্যাদাকে ভীষণভাবে নষ্ট করে দিল। এ বন্দোবস্তের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের জমির মালিক পদে প্রতিষ্ঠা।]

হান্টার তাঁর বইয়ের আর এক জায়গায় বলেছেন, 'A hundred and seventy years ago it was impossible for a well-born Mussalman in Bengal to be poor; at present it is impossible for him to continue rich.'

কোম্পানীর শাসনকাল থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংরাজের হিন্দু-তোষণ নীতি অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে। মাঝে

মাঝে কোন কোন ব্রিটিশ সরকার বা শাসক মুসলমানের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের প্রতিকার করতে হয়তো চেয়েছেন ; কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারেন নাই। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠিত হয়। সারা ভারতের সংখ্যাগুরু হয়েও মুসলমানের এই প্রাদেশিক সংখ্যাগুরুত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ব্রিটিশ সরকার একে চিরদিনের মীমাংসিত সত্য বলে ঘোষণা করেও তা পাল্টিয়ে নিতে বাধ্য হন। স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট দিল্লীতে এসে ১৯১১ সনে তা রদ বলে ঘোষণা করেন। বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ উপলক্ষে যে সম্রাটকে খোশ-আমদেদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তার উল্লেখ ইঙ্গ-হিন্দু-আঁতাত বুঝার অনেকখানি সাহায্য করতে পারে :

'বাজুক শঙ্খ উড়ুক নিশান
বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা ভারতের রাণী
ভারতে এসেছে আজি।'

ইংরাজ আগমনের পর থেকেই মুসলমান ছিল দুর্দিনের যাত্রী। ওহাবী আন্দোলন ও আজাদীর লড়াইয়ের পর থেকে ইংরাজের মুসলমান-বিদ্বেষ বজ্রের মত মুসলমানের উপর আবর্তিত হয়। আযাদীর লড়াই যখন আসল, তখন গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ধারে গাছে গাছে বহু মুসলমানকে ফাঁসীতে লট্‌কায়ে রাখা হয় কিছুদিন ত্রাস সঞ্চার করার জন্যই এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দরুনই তা করা হয়। ফারসী ভাষাকে অপসারণ, মুসলমানের জমিদারী-জায়গীরদারীর হস্তান্তর, চাকরিতে মুসলমান বর্জন, হিন্দুর সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতে উৎসাহদান ইংরাজরা ভেবেচিন্তেই করেছিল।

পক্ষান্তরে মুসলমান যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টায় বিফলকাম হল, তখন তারাও তর্কে মোয়ামেলাত বা অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করল। কেউ কেউ মুসলমানের সে সময়কার ইংরাজী শিক্ষা বর্জনকে ভুল বলেন। ইংরাজী শিক্ষার পথ রোধ করে সেদিন যা দাঁড়িয়েছিল তা হল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংঘাতমুখী দুইটি পরস্পর-বিরোধী জাতীয় শিবিরের স্বাভাবিক ভূমিকা। এ ভিন্ন বোধ হয় গত্যন্তরও ছিল না। তারপর অবস্থার

পরিবর্তন ও উন্নতি যেদিন হল, সেদিন ইংরাজ ও মুসলমানের স্ব-স্ব নীতি ও বদনাম এবং উভয়ের মধ্যে জানাজানির পথও প্রশস্ত হয়ে উঠল।

পাক-ভারতের মাটিতে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার যতটুকু আলোচনা এখানে করা হল তাতে যা দেখা যায়, হিন্দু ও মুসলমানের মিলবার ও মিলাবার আয়োজন এখানে হয়েছে, কিন্তু সার্থক হয় নাই। ভারত তার ঐক্যের জারক রসে অনেক জাতিকেই এর আগে হজম করেছে, কিন্তু মসলমানকে হজম করতে পারে নাই। কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম, তাহজীব-তমদ্দুন ও জীবন এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বলেই তা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই, মুসলমান আমলে সমন্বয়বাদীরা নিরাশ হয়েছেন। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে হিন্দু মুসলমানের উজ্জীবিত বিরোধকে ইংরাজরা তাদের সাম্রাজ্যিক এবং শাসন-শোষণের স্বার্থে লালন করেছেন ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। এমনকি যে বিদ্বেষটি এতদিন ছিল ভোঁতা, তাকে নানা-ভাবে ধার দিয়ে ইংরাজরাই অধিকতর শানিত করে তুলেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মুসলমানকে দমন ও বিলোপ সাধনের যে চেষ্টা চলে, তাতে মুসলমান অধিকতর অসহযোগ্য ও স্বাতন্ত্র্যের নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণের পর আস্তে আস্তে ব্রিটিশ নীতি বদলায় এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থে অখণ্ড ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তা গঠনের কোশেশ চলে। কিন্তু তখন ব্যবধান এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, এচেষ্টা একটা গোঁজামিলের অত্যাচারে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদের অবস্থা তখন মুসলমানের চাইতে ঢের ঢের ভাল। ইঙ্গ-হিন্দু সহযোগিতায় সুফলের সিংহের ভাগ তখন হিন্দুর করায়ত্ত। সেখানে এসে মুসলমানের প্রতি যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করা দূরে থাকুক, প্রবেশাধিকারের সুযোগও তার সবক্ষেত্রে মিলত না। আইন-সভায়, চাকরি-বাকরিতে তার অবরুদ্ধ দ্বার খুলতে যাওয়ার অর্থ ছিল কায়েমী স্বার্থের সাথে বিবাদ। এ বিবাদই শেষে মুসলমানকে স্বতন্ত্র রাজনীতির পথে নিয়ে গেল। স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি মুসলমানের মন জয় করল এবং অবশেষে একদিন তাকে তার মঞ্জিল মোকসেদে নিয়ে পৌঁছে দিল।

মুক্তি সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলন

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, পাকিস্তান আন্দোলন একটি অত্যাধুনিক কালের ঘটনা। মাত্র ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব পরিকল্পিত হয় এবং ১৯৪৭ সনে আমরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত রূপ দেখতে পাই। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনিশ শতকেই আমরা এর সংগ্রামী রূপে পরিচিত হই। ১৮২৬ সালে মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ আজাদীর জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের পতাকা তুলেন। তখন থেকেই তার সূত্রপাত। এই সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ইহা ধর্মীয় সংস্কারের রূপ ধারণ করে। এর পরে স্যার সৈয়দ আহমদ শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করে নিলেন। ১৯০৬ সনে এ আন্দোলন দলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নূতন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলিম রাজনীতি ও জাতীয় কর্মধারার সশস্ত্র সংগ্রাম, ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও দলীয় গণতান্ত্রিক সংগঠনের বিবর্তিত স্তর ক্রমানুক্রমিক প্রকাশকে কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করতে পারেন কিন্তু আসলে এই সবকয়টি আন্দোলন আদর্শভিত্তিক ইসলামকে কেন্দ্র করেই এসবের প্রত্যেকটি পরিকল্পিত হয়েছিল।

১৮২৬ সনে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিখদের পরাজিত করে পেশোয়ার দখল করেন। সংগ্রাম-রত অবস্থায় বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। ইতিহাসে তিনি বালাকোটের শহীদ বলে পরিচিত।

এসময় কলিকাতার অদূরবর্তী চব্বিশ পরগণায় তিতুমীরও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'র বিরুদ্ধে বার বার ব্রিটিশ ফৌজ প্রেরিত হয়। চব্বিশ পরগণা ছাড়াও নদীয়া, ফরিদপুর জেলায় তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১৮৩১ সনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তিনি প্রাণ দেন।

বালাকোটের যুদ্ধের পরও সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা পাটনা ও সরহদ্দ থেকে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করেছিলেন ও তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে গোলমাল সৃষ্টিরও চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলন শেষে ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

এর মাঝখানে ১৮৫৭ সনে আজাদীর লড়াই বা ইংরাজ ঐতিহাসিক কর্তৃক আখ্যায়িত সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সশস্ত্র বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় মুসলমান এবং বিদ্রোহ দমনের পর তারাই শাস্তি ভোগ করে বেশী। শেষ মোগল সম্রাট এ-জন্যই রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তবে সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু রাজা ও সিপাহীরাও যোগ দিয়েছিল। পাঁচমিশালী স্বার্থ ও সাংগঠনিক ঐক্যের অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও তাঁর অনুসারীদের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারের আন্দোলন যদিও উনিশ শতকের ঘটনা, তবু এই সংস্কার আন্দোলনের উৎস আমরা আঠার শতকে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র কার্যাবলীর ভিতর আবিষ্কার করতে পারি। শুধু বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদই তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন না, জৈনপুরের মাওলানা কেরামত আলী, হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ প্রমুখ মুসলিম বাংলার পরবর্তীকালীন সংস্কারকেরাও ছিলেন একই ধারার অনুগামী।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে মুসলিম ভারতের চিন্তারাজ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাতে আর একটা মোড় পরিবর্তন ঘটালেন স্যার সৈয়দ (১৮১৭—৯৮)। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতাজাত হতাশার মধ্যে নূতন আশার বাণী শুনালেন স্যার সৈয়দ আহমদ। সর্বদিকদর্শিতা, বিভিন্নমুখিতার ভিতর চিন্তা ও মতামতের ভারসাম্য নিয়ে স্যার সৈয়দের পূর্বে মুসলমানের এরূপ সঙ্কটসন্ধিতে আর কোন নেতা ও কর্মবীর এসেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। স্যার সৈয়দ সকলকে বললেন, দেখালেন এবং বুঝালেন যে মুসলমান দুনিয়া ও আখেরাতের হাসানাত সমানভাবে চায়। ধর্ম তার সব আচ্ছন্ন করে আছে ও থাকবে, কিন্তু দুনিয়ার সাথে এবং তার অগ্রগতির সাথে তার বিরোধ নাই। তিনি শিক্ষা সংস্কারে তাই মনোযোগ দিলেন এবং আলীগড়ে এংলো মোহামেডান স্কুল স্থাপন করে হাতে-কলমে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর নয়, কল্যাণকর। স্যার সৈয়দের আলীগড় মুসলিম জাগরণের কেন্দ্র হয়ে তারই পরিচয় বহন করেছে দীর্ঘকাল।

১৮৮৬ সনে স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে 'দি মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে'র (The Muhammedan Education

Conference)-প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলমানের শিক্ষা সম্প্রসারণে এ প্রতিষ্ঠানটির নাম অমর হয়ে আছে। কিন্তু তিনি শিক্ষার সম্প্রসারণ আন্দোলন নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারেন নাই। তিনি এসময় নওয়াব মুহসিন-উল-মুল্‌ক-কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর মনোভাবের পরিচয় মিলে।

In the manner in which the Muslims rights are being trampled upon and attacked from all sides and the tone of the number of articles that are being published against us, it is impossible for the Muslims to keep their tongue tied and be a mere passive observer. Who can deny that by such move Muslims will not be hard hit ? To remain indifferent to this and to be stagnant and to concentrate all our energies in the making education popular in an ideal impossible to achieve and act upon —

[যেভাবে মুসলমানের অধিকারকে পদদলিত করা হইতেছে, যে-ভাবে সকল দিক হইতে আক্রমণ চলিতেছে এবং যে সুরে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে সে ভাবে তা চলিলে মুসলমানের চুপ করিয়া এবং নীরব দর্শক সাজিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। কে অস্বীকার করিবে যে এসব চেষ্টার ফলে মুসলিম স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না ? এসময় উদাসীন থাকা ও কিছু না করা এবং শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করার স্বপ্ন অবাস্তব ও এচিন্তা অর্থহীন।]

স্যার সৈয়দের এ উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু শিক্ষা আন্দোলন লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। মুসলমানের রাজনৈতিক দল গঠনের কথাও চিন্তা করেছিলেন।

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। এর পূর্ববর্তী কয়েকটি বছর ছিল পাক-ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিস্ফোরণধর্মী। আই-সি-এসের পদে দেশী লোক গ্রহণ না করা, ইলবার্ট বিলের বৈষম্য-মূলক প্রস্তাব প্রভৃতি মিলে সর্বত্র একটা উত্তেজনার হাওয়া বইতে থাকে। স্যার সুরেন্দ্র তখন দেশময় তাঁর বক্তৃতার আগুন ছড়াচ্ছিলেন। ব্রিটিশ শাসন-কর্তরা এ রাজনীতিকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব হলেন।

অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস হিউস সাহেব ছিলেন একাজে সর্বাধিক উৎসাহী। তখন লর্ড ডাফরীন ছিলেন বড়লাট। তিনিও তাতে উৎসাহ্ দিলেন এবং বললেন, 'ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট জনমতের খবর সরকারের জেনে রাখার দরকার আছে।' পুনাতে ডবলিউ. সি. বানার্জীর সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনধন্য হয়ে ১৮৮৬ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৭২ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন মুসলমান ছিলেন। কিন্তু প্রথম অধিবেশনের বক্তৃতায় কংগ্রেসীদের আনুগত্যের সুর সরকারকে মুগ্ধ করে। কিন্তু শীঘ্রই কংগ্রেসের সুর পাল্টায় ও কংগ্রেস-সরকার সম্পর্কে অবনতি দেখা দেয়।

মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিবে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে বহুবার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং ১৯৩৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত এ নিয়ে নানা ধরনের বিতর্কের অবতারণাও হয়েছে। স্যার সৈয়দ প্রথম থেকেই মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদানের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। এক জাতি, যুক্ত নির্বাচন প্রভৃতি ছিল হিন্দু নেতাদের আদর্শ। এ-নীতিতে স্যার সৈয়দ বিশ্বাস করতেন না। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি তিনি কামনা করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন যে, 'ভারত মাতার দুইটি চক্ষু একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমান।' কিন্তু মিলিত জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন মুসলমানের জন্য তিনি ক্ষতিকর মনে করতেন। ১৮৮৩ সনে স্যার সৈয়দ তাই বলেন, 'For socio-political purposes the whole of the population of England forms but one community. It is obvious that same cannot be said of India. The system of representation by elections means the representation of the views and interest of the majority of the population, and in the countries where the population is composed of one race and one creed, it is, no doubt, the best system that can be adopted. But in a country like India, where caste distinctions still flourish, where there is no fusion of the various races, where religious distinctions are still violent, where education in its modern sense has not made an equal or proportionate progress

among all sections of the population.... The system of election, pure and simple, cannot safely be adopted. The larger community will totally override the interests of the smaller community.'

[সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের সকল লোক একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। ইহা পরিষ্কার যে, এ কথা ভারতের বেলা খাটে না। নির্বাচনী পদ্ধতির মারফতে প্রতিনিধিত্বের অর্থ হইল যে, সংখ্যাগুরুর মতামত ও স্বার্থের প্রতিফলিত রূপ তাতে দেখা যায়। যে সকল দেশের মানুষ এক জাতি ও একই মতে বিশ্বাসী, সে সকল দেশে, এ-প্রথা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভারত তা নয়। এখানে এখনও বর্ণবৈষম্য প্রথা বিদ্যমান, এখানে সব জাতি মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই, এখানে এখনও ধর্মীয় বিরোধ হিংস্র রূপ ধারণ করে এবং এখানে এখনও সকল লোকের ভিতর সমানভাবে বা আনুপাতিক হারে শিক্ষার প্রসার ঘটে নাই। সুতরাং এখানে সহজ ও সরল নির্বাচনী নির্ভয়ে গ্রহণ করা চলে না। তা করা হইলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ দলিত করিয়া চলিবে।]

সুতরাং যখন কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুসলমানের প্রতি ডাক এল, তখন স্যার সৈয়দ তাতে অসম্মতি জানালেন। কিন্তু শুধু শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্রিটিশ শাসক ও মুসলমানের মধ্যে নানা কারণে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য কাজ করে গেলেই মুসলমানের তেমন লাভ নাই; তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, মুসলমানের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর অবিচার প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে পুস্তক-পুস্তিকাও কয়েকটি লিখেছিলেন। কিন্তু সবকিছুই যে একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে বানচাল হয়ে যাচেছ, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যাচ্ছিলেন তা এবং তাঁর মনের কথা তার এডুকেশন কনফারেন্সে বিশিষ্ট স্তম্ভ নওয়াব ভিকার-উল-মুলককেও লিখে জানিয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ ইন্তেকাল করলেন। তাঁর 'শিক্ষা সম্মেলনের' আন্দোলন বেঁচে রইল। এই শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগেই ১৯০৬ সনে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যানুভূতির তীব্র ও ঐতিহাসিক তাগিদে ১৯০৬ সনে 'শিক্ষা সম্মেলনের' ঢাকা অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় যে মানুষটি মুসলিম বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি স্যার সলিমুল্লাহ্। স্যার সৈয়দ ও অন্যান্য মুসলিম নেতা সেদিন কংগ্রেসে যোগদানের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁরা মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। সেদিন শাসনতান্ত্রিক অধিকার বণ্টনের আলোচনায় ও বিতর্কে দেশের আকাশবাতাস ছিল তপ্ত ও মুখর। পূর্ব বংগ ও আসামকে নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব ছিল দীর্ঘদিনের। শাসনতান্ত্রিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তা প্রস্তাবিত হয়। মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলার চিরদিনের উপেক্ষার প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার তাগিদও এ প্রস্তাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯০৫ সনে বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নূতন প্রদেশ জন্ম নিল। পশ্চিম বাংলার, বিশেষ করে কলিকাতার শোষণের এলাকা এভাবে হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে হিন্দুদের তরফ থেকে ভীষণ আন্দোলন শুরু করে দেওয়া হয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ দেশময় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। হিন্দুরা এ আন্দোলনের নাম দিলেন 'স্বদেশী'। ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ধুম পড়ে গেল। ইতস্ততঃ ত্রাসপন্থীরাও হত্যা, খুন-খারাবী এবং ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করল। মুসলমানরা শান্তভাবে রইল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ-নয়া প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, Settled fact বা মীমাংসিত সত্যের মর্যাদা ব্রিটিশ কতৃপক্ষ রক্ষা করবেন। বিশ্বাসভংগের চুনকালি তাঁরা মাখাবেন না। কিন্তু ১৯০৫ সনে তা দিলেও ১৯১১ সনে তা রদ করে দেওয়া হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ্ এর ফলে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন। মনে হয় নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌কে বংগভংগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তখন ক্ষুব্ধকণ্ঠে সলিমুল্লাহ্ বলেছিলেন, a bait, a bribe and a bribe a halter of disgrace round my neck. ১৯১৬ সনে তিনি মারা যান।

যা'হোক বিশ শতকের যাত্রাতেই বুঝা যায় যে শীঘ্রই রাজনৈতিক আবহাওয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতি হিসাবে বাঁচা ও টিকে থাকার জন্য মুসলমানের নিজস্ব রাজনৈতিক দল চাই। এ চাওয়ার জওয়াব হিসাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলিম লীগের জন্মের জল্পনা-কল্পনার দিনেই মুসলিম-প্রধান বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল। হিন্দু আন্দোলনের প্রবল স্রোত ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার দরুন তা ভেসে যায়। মুসলিম লীগ তাকে টিকিয়ে রাখতে পারে নাই। তবে এই নূতন প্রদেশ ও মুসলিম লীগ ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনার ইশারা বয়ে এনেছিল, তখন তা বুঝা যায় নাই। কিন্তু পাকিস্তানের মজবুত মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ আমরা বুঝি যে সেই নূতন প্রদেশটি ও মুসলিম লীগ আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ। পূর্ব বংগ ও আসাম প্রদেশ ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি পাকিস্তান। সেদিনেরই উপ্ত বীজ আজ মহামহীরুহে রূপান্তরিত।

সেদিন এ-নূতন প্রদেশ গঠনে যারা কেঁদেছিল তারা যে লোভ ও লাভের পথে কাঁটা পড়ছে ভেবেই কেঁদেছিল, তাও আজ পরিষ্কার। তাদের অখণ্ড বংগপ্রেম যে মেকী, তা পাকিস্তানের স্বীকৃতির পরই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন সকলে সকৌতুকে লক্ষ্য করল তারাই তখন পার্টিশনী (Partitionist). পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে কেটে পড়ে ভারতগামী হয়েছে। যুক্ত বাংলার জন্য তাদের প্রেম কর্পূরের মত তখন উবে গেল।

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুসলমানের জন্য আইনসভায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী গোড়ার দিকেই জোরেশোরে উত্থাপন করা হয়। নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মুসলমানের নিকট ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন ভিন্ন আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের আশা দুরাশা মাত্র এবং তা ভিন্ন মুসলমানের স্বার্থ ও অধিকারকে নিরাপদ করার কোনো উপায় নাই। ১৮৯২ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট (Indian Council Act) মোটামুটি পরোক্ষভাবে নির্বাচনী পদ্ধতির প্রবর্তন করে। ব্যবস্থাপক কাউন্সিলগুলিতে এই আইন মোতাবেক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি মনোনয়নের জন্য সরকারের নিকট নাম প্রস্তাব করে পাঠাতে পারত। দেখা গেল, ১৮৯২ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত কোন কাউন্সিলে একজন মুসলমানেরও প্রতিনিধি হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। ১৯০৬ সনে ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন

করার কথা ঘোষিত হয়। মুসলমানের তরফ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়। লর্ড মিন্টো তখন ভারতের বড়লাট। মাননীয় আগা খাঁ'র নেতৃত্বে একটি মুসলিম ডেপুটেশন ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসে শিমলায় বড়লাটের সাথে দেখা করেন। ইহা ইতিহাস-বিখ্যাত শিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত। ডেপুটেশন বড়লাটের নিকট থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পায়। এ-বছরই ডিসেম্বর মাসে লীগ গঠনের প্রস্তাব হয়। ডেপুটেশনের সাফল্য যে মুসলমানের মনে অনেকখানি সাংগঠনিক উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। যা'হোক, নব প্রতিষ্ঠিত লীগ মুসলমানের মধ্যে সংগঠনের বাণী ছড়ায় ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা চালু করার জন্য আন্দোলন করতে থাকে। ১৯০৯ সনে যে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Act) পাস হয়, তাতে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী মেনে নেওয়া হয়।

পাকিস্তানের ভিত্তি রচনায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের গুরুত্বকে সত্যই অসীম বলা যায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকৃত হওয়ায় দু'টি লাভ হল। প্রথমতঃ তার ফলে কাউন্সিলগুলিতে মুসলমান কর্তৃক নির্বাচিত মুসলমান প্রতি-নিধিরা মুসলমানের দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ ও ভাষা দেওয়ার সুযোগ পেলেন এবং সেখানে মুসলমান স্বার্থ ও অধিকারের অতন্দ্র ও নির্ভরযোগ্য প্রহরীর মত কাজ করার দায়িত্ব লাভ করলেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বীকৃতিতে অখণ্ড-ভারত ও মিলিত জাতীয়তার অচলায়তনে বড় রকমের ফাটল ধরল। মিলিত জাতীয়তার সর্বগ্রাসী জারকরসে মুসলমানকে হজম করার কাজে কংগ্রেস বাধা পেল। স্বতন্ত্র নির্বাচনকে মুসলিম জাতীয়তার প্রথম সনদ বলেও অভিহিত করা হয়। মুসলমান স্বাধীনভাবে তার ভবিষ্যতকে বেছে নেওয়ার পথকে প্রথমই এর বদৌলতে বাধামুক্ত করার সুবিধা পেল। স্বতন্ত্র নির্বাচনের ফলেই তার জন্য নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হল। মুসলমান নূতন আকাশ ও আলো-বাতাসের খবরও তার সাহায্যে পেয়ে গেল। ১৯০৯ সনের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী প্রতিষ্ঠারই দূর-প্রতিধ্বনি পাকিস্তান।

স্বতন্ত্র নির্বাচনে সবচাইতে বেশী ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন ভারতের হিন্দু নেতৃবর্গ ও তাঁদের কংগ্রেস। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র নির্বাচন বনাম যুক্ত-নির্বাচনের সংগ্রাম পাকিস্তানের জন্ম দিন পর্যন্ত থামে নাই। এমন কি তারই

ছায়া দেখে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে সেদিন পর্যন্ত আঁতকে উঠতে দেখেছি। লীগ ও কংগ্রেসের সুদীর্ঘ লড়াইয়ের একটি কারণ ও উপলক্ষ ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন। স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার অর্জন এদেশের মুসলিম ইতিহাসে পাকিস্তান পাওয়া ছাড়া সর্বাধিক বড় ঘটনা। স্বতন্ত্র নির্বাচন ও পাকিস্তান একই রাজনীতির আদি ও শেষ পর্ব। বীজ থেকে মহীরুহের রূপান্তর ধরে নিয়ে বিচার করলেও ভুল কিছুই করা হবে না।

মুসলমান যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচনকে রাজনৈতিক স্থিতির নোঙর করে তা আঁকড়ে ধরে রইল, তেমন এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও আঘাত করে চলল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ১৯১১ সনের মিন্টো-মর্লী সংস্কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল অনেক। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

১৯১০—১৯২০

মিন্টো-মর্লী রিফরম যদিও মুসলমানকে স্বতন্ত্র নির্বাচন দিয়েছিল, তবু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকটি তাদের জন্য একটি আশাভংগের যুগ বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হবে। ১৯১১ সনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বাস্তবায়িত এবং স্থায়ী ঘোষিত সিদ্ধান্তটি বাতিল হয়ে গেল। ফলে, মুসলমান ইংরাজের প্রতি বিশ্বাস হারাল। শুধু ঘরোয়া ব্যাপারে নয়, মুসলিম জাহানের আরো কয়েকটি প্রশ্নে মুসলমান অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের প্রশ্নে ও ইতালীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে মুসলমান ব্রিটিশের নিকট থেকে যে মনোভাব আশা করেছিল তা তারা পায় নাই। তার দরুন ব্রিটিশের প্রতি মুসলমানের মনোভাব বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এ-সময় মুসলমানকে নেতৃত্বদান করছিলেন মহামান্য আগা খাঁ। লীগের সাথে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দহরম-মহরম ক্রমেই বাড়তে থাকে। জিন্নাহ্‌ তখন কংগ্রেসের একজন প্রতিপত্তিশালী নেতা। তিনি লীগ-কংগ্রেসের ও তারই মাধ্যমে মুসলমান ও হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলন একই খাতে আনবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। যদিও জিন্নাহ্‌ তখন পর্যন্ত ষোলআনা কংগ্রেসী, তবু তিনি নানা কাজের ভিতর দিয়ে, বিশেষ করে

ওয়াক্ফ-উল-আওলাদ বিলের বিতর্কে সরকারকে ঘায়েল করে মুসলমানের মন জয় করেছিলেন। কংগ্রেসে থাকলেও তাঁকে মুসলমানেরা তাদের আশা-ভরসার স্থল বলে মনে করত। জনাব জিন্নাহ্‌র উদ্যোগে লীগ ও কংগ্রেসের একাধিক বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশন একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সনের এলাহাবাদ অধিবেশনের পর থেকে ১৯১৩ সনের লাখনৌ অধিবেশন পর্যন্ত জিন্নাহ্‌ দুই প্রতিষ্ঠানের মিলনদূত হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রভাবে মুসলিম লীগের সরকারের প্রতি আনুগত্য-শীল রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৩ সনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তখন মুসলিম লীগ চরমপন্থী রাজনীতি গ্রহণ করে নাই। তবে সরকারের প্রতি লীগের মত স্পষ্টতঃই বিরূপ। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তুর্কীর খেলাফতকে অক্ষুণ্ন রাখার এবং সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দাবীর ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের কথা দেয়। ১৯১৬ সনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের লাখনৌতে সম্মেলন বসে। এতে লীগ-কংগ্রেসের যে চুক্তি হয়, তা লাখনৌ চুক্তি নামে বিখ্যাত। লাখনৌ চুক্তির প্রধান প্রধান কথা ছিল : মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে একযোগে ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করবে, আইনসভায় মুসলমানের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং তাদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার থাকবে।

লাখনৌ প্যাক্ট পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। কারণ, এ চুক্তিতেই স্বীকৃত হয় যে, মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ চুক্তিতেই নির্ধারিত হয় যে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে যথাক্রমে মুসলমান সদস্য সংখ্যা হবে ৫০, ৩০, ৪০, ২৫, ১৫, ১৫, ও ৩৩।

লাখনৌ চুক্তির বিশেষত্ব হল যে, কংগ্রেস সর্বপ্রথম অবিমিশ্র মনে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলিম লীগের মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী মেনে নিল। মিন্টো-মর্লী সংস্কার স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার মুসলমানকে দিলেও কংগ্রেস ও হিন্দু ভারতের সমর্থন তখনও পাওয়া যায় নাই। এর বিরুদ্ধে তাঁরা এতোদিন তীব্র ও তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে

এসেছিলেন। সাময়িকভাবে এ প্রতিবাদের ঝড় থেমে গেল ও ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে ক্ষমতা হস্তান্তর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল। এই মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও লীগের অখণ্ড প্রতিনিধিত্ব দাবী পালাক্রমে কংগ্রেস একবার মেনে নিয়েছে এবং আর একবার অস্বীকার করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের সম্মতি-অসম্মতিকে উপেক্ষা করে লীগের রাজনীতি অগ্রসর হয়েছে। ১৯১১ সনের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পর মুসলমান তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার দ্বিতীয় মঞ্জিলে ১৯১৬ সনে লাখনৌ চুক্তির মাধ্যমে পৌঁছে। ১৯৩৫ সনের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ তার তৃতীয় সাফল্যের মঞ্জিল। এ-পথ বেয়ে এগিয়ে চলেই ১৯৪৭ সনের ঘোষণায় মুসলমান তার মঞ্জিল মোকসেদ পাকিস্তান অর্জন করে।

খেলাফত আন্দোলন

মহাযুদ্ধের ডামাডোল যখন শান্ত হবে, তখন দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক স্বরাজ আসবে এবং খেলাফত স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে— এ আশা নিয়েই মুসলমান তুর্কীর খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আনুগত্যের কঠিনতম পরীক্ষায় মুসলমান উত্তীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ এ আনুগত্যের দাম দিল না। তুর্কীর বিশাল সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির আঘাতে ভেঙে গেল। তারই সাথে খেলাফতের মৃত্যু ঘোষিত হল। ব্রিটিশের এই প্রতিশ্রুতি ভংগের বিরুদ্ধে মুসলিম ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই বিক্ষুব্ধ মুসলমানের নেতৃত্ব দিলেন পুরুষসিংহ মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী এবং আরও অনেকে। কংগ্রেসের নেতা হিসাবে গান্ধীজী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে হাত মিলালেন। হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের এবং তার অনুগামী জনতার মধ্যে এ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। হিন্দু-কংগ্রেস সর্বপ্রথম মুসলমানের সহযোগিতা লাভ করে সেদিন অভাবিতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করল। গান্ধীজীর নেতৃত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন করার কাজে যদি কারো দান থেকে থাকে, তবে বিশেষভাবে সেদিন ছিল আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্যাগদীপ্ত এবং নির্ভীক সহযোগিতা। মুসলমানের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে সেদিন কংগ্রেস সে-কংগ্রেস হত কি-না এবং গান্ধীজী সে-গান্ধীজী হতেন কিনা, এ-তর্ক তোলার নিশ্চয়ই অবকাশ আজ আছে।

গান্ধীজী ১৯২১ সনে তর্কেমোয়ামেলাত বা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণা করলেন। হিন্দু-মুসলিম নেতারা মিলিত কণ্ঠে ডাক দিলেন, 'স্কুল ছাড়', 'কলেজ ছাড়', 'গোলামখানা খালি করো', 'আইন-আদালত, বিলাতী পণ্য বর্জন করো'। আসমুদ্র-হিমাচল এ আন্দোলনে দুলে উঠল। তরংগিত হল। পাক-ভারতের ইতিহাসে সে একদিন যা খুব কমই এসেছে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খালি হল—জেলের পর জেল অসহযোগীতে ভরে গেল।

এ সময় আরো একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত মুসলমান গ্রহণ করল। মুসলমান দেশত্যাগ ও হিজরত করার প্রস্তাব নিল। তারা ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হল। আঠার হাজার মুসলমান তার বাড়ী-ঘর জমিজমা বেচে দিয়ে আফগানিস্তানের পথে বের হল। আফগান-সরকার সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন। এর পরিণাম হল অত্যন্ত করুণ। কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী পথে বহু মুসলমান খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে মারা গেল। গান্ধীজী তখনও খেলাফত ও কংগ্রেসের অসহ-যোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করে যাচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কতকটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঠিক এমনি সময় চৌরীচৌরায় একটা হাংগামা বেধে গেল। ক্ষিপ্ত জনতা চৌরীচৌরা থানায় আগুন দেয়। কয়েকজন পুলিসকে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে গান্ধীজী হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। দাংগা সেখানে মারাত্মক ধরনেরই হয়েছিল এবং ক্ষিপ্ত জনতা গান্ধীজীর অহিংসার মর্যাদা রাখে নাই সত্য; তা সত্ত্বেও অনেকের ধারণা, সাফল্যের পথে এসে গান্ধীজীর আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ ছিল রহস্যপূর্ণ। কারণ, এতে আন্দোলন বন্ধ করার অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হল। সংগে সংগে দেশে নূতন করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রশ্ন মাথা তুললো। তাদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করল।

মুসলিম জাহানের দুঃসময়ে এবং খেলাফতের সম্মানার্থ পাক-ভারতের মুসলমানের এ-দুঃখ বরণ পাশ্চাত্যের নিকট বহু দিন ধরে নিন্দনীয় হয়ে আসছে। পাশ্চাত্যের ও তার শিক্ষানবিস অন্যান্য দেশের একদল রাজনীতিবিদ এর ভিতর প্যান ইসলামিজমের জুজু আবিষ্কার করে অতীতে

আঁতকে উঠেছেন এবং এখনও আঁতকে উঠেন। জামালুদ্দীন আফগানী উনিশ শতকের শেষে মুসলিম জাহানের জাগরণের ও বিশ্ব মুসলিম সংহতির বাণী নিয়ে চারণের বেশে দেশে দেশে ফিরেছিলেন। এজন্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কোপ তাঁর উপর পড়েছিল। ১৯০৩ সনে জামালুদ্দীন আফগানী ভারতেও এসেছিলেন এবং নব-জীবনের স্ফুলিংগ তিনি নানাস্থানে ছড়িয়ে যান। মুসলিম জাহানের এ ঐক্য ও জাগরণের ভিতর আক্রমণাত্মক কিছু ছিল না। পররাজ্যের প্রতি লোভও এ আন্দোলনের মধ্যে প্রশ্রয় পায় নাই। তবে মুসলমানের বহু দেশ ও এলাকা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করেছিল।. এবং তার স্থানে স্থানে ঘাটি স্থাপন করেছিল। এরই বিনাশ ও বিলুপ্তি জামালুদ্দীন আফগানী চেয়েছিলেন। এ চাওয়ার ও এ সাধনার বীজ নানা দেশে তিনি ছড়িয়ে দিলেন। পাক-ভারতের অনুকূল পরিবেশে এ-ভাবধারা শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলমান ভাই ভাই এক, অখণ্ড এক এ বিশ্বাস মুসলমানের ধর্মের অংগ। সুতরাং জামালুদ্দীনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শকে ধর্মভীরু মুসলমান যদি অন্তর ও জীবন মরণের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, তাতে হয় সাম্রাজ্যবাদীর অসহিষ্ণুতা বোধগম্য কিন্তু ন্যায় ও বিচারধর্মী মানুষের তাতে ক্ষুব্ধ বা বিরূপ হওয়ার কিছু নাই। মুসলমানের স্বাজাতিকতা ও ধর্মীয় মনোভাব বুঝতে হলে ইসলামের এই মৌলিক মূল্যবোধটির আবেদনকে বুঝতে হবে।

আরও একটি জিনিস পাক-ভারতীয় মুসলমানের বেলায় ধীরভাবে না বুঝলে একটা প্রকাণ্ড ভুল করা হবে। পরাধীনতার জ্বালা, পলাশীর পরাজয়, 'ওহাবী' যুদ্ধের ব্যর্থতা, আজাদীর লড়াই-এর অসাফল্য—এক কথায় যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার দুঃখ খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষা পেয়েছিল ও অভিব্যক্তি খুঁজেছিল। মুসলমানের জাগ্রত মনে ছিল খেলাফত উদ্ধারের কামনা, কিন্তু তার অবচেতন মনে একই সময়ে ছিল পরাধীনতার মর্মপীড়ার দাহ। খেলাফত ও স্বদেশের আজাদীর স্বপ্ন একটি আন্দোলনের ভিতরই এক হয়েছিল এবং অভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা না হলে খেলাফত আন্দোলনের সে জাগ্রত জোয়ারের পুরোপুরি অর্থ করা হয় বলে মনে হয় না। তাই পাকিস্তানের উৎসমূল থেকে খেলাফত আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে

যাওয়াও অনুচিত হবে। মুসলমানের মর্মবাণীর সঠিক প্রতিধ্বনি পাই সেদিন লীগের নবনির্বাচিত স্থায়ী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কথায়, 'আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের ধর্ম—এই দুইয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ভারতের বা ইংল্যাণ্ডের গবর্নমেণ্ট কারো উপর আজ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।' ধর্মভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নাংকুর এর ভিতর তন্ময় হয়েছিল। খেলাফত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলীর সেই অমর কথাটিও এখানে একই অর্থে স্মরণীয়—Free Islam in free India (আজাদ ভারতে আজাদ ইসলাম)। আজাদী লাভের পর মুসলমান তার মাতৃভূমি ভালবাসে, কিন্তু মুসলিম জাহানকেও সমানভাবে ভালবাসে; 'মুসলিম হেঁ হাম ওয়াতান হ্যায় সারা জাঁহা হামারা'—কথাটি মুসলমানের ঈমান ও ঐতিহ্যের মর্মমূলে স্থান গ্রহণ করেছে।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দেশের আবহাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাংগা এবং তিক্ত বিতর্কে বিষিয়ে উঠল। হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠনের আন্দোলন বড় হয়ে উঠল। কয়েকটি বড় বড় শহরে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর দাংগা হয়ে গেল। এলাহাবাদ, কলিকাতা, কোহাট প্রভৃতি স্থানে মানুষের রক্তে পথঘাট রঞ্জিত হল। ডাঃ কিচলুর মত মানুষও 'তানজিম' ও 'তবলীগ' আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হলেন। এসময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দু ও মুসলমানের সমঝোতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোনও ফল হল না। খেলাফত ও অসহযোগের সংগ্রামকালীন জোট খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। কয়েক বছর ধরে লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন একত্র হওয়ার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। ১৯২৪ সনে এর ব্যতিক্রম ঘটল। ১৯২৪ সনে স্যার রেজা আলী লীগের এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। তিনি লীগের স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্পষ্ট করেই ঘোষণা করলেন।

লীগের স্বাতন্ত্র্য ও হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের সুর ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। শাসনতান্ত্রিক কারবার-দরবারে চাকরি-বাকরিতে মুসলমান-বর্জিত যে শাসন দেশে চলছিল, তার প্রবল প্রতিবাদ করা হয় ১৯২৫ সনে। আলীগড়ে মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্যার আব্দুর রহীম শাসনকার্যের সর্বক্ষেত্রে মুসলমান-বঞ্চনার ছবি তুলে ধরলেন এবং

তার বাস্তব প্রতিকারের দাবী জানালেন। স্যার আব্দুর রহীমের আলীগড় বক্তৃতার বিরুদ্ধে হিন্দুনেতা ও সংবাদপত্র মুখর হয়ে উঠলেন। এর কিছু পরে একটি ব্যাপারে লীগ ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে কিছুকালের জন্য একটা ঐক্য গড়ে উঠে। শাসনতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে লীগ-কংগ্রেসের অসন্তোষ যখন ব্যাপক হয়ে উঠে এবং মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফরম যখন ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি বর্জন করে চলল, তখন ব্রিটিশ সরকার একটি রাজকীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব করলেন। লর্ড সাইমন ছিলেন এ-কমিশনের সভাপতি এবং তাই এর নাম হয় 'সাইমন কমিশন'। এ কমিশনের সদস্যেদের মধ্যে একজনও ভারতের লোক ছিলেন না বলে সকল দলই একে বর্জন করে। সাইমন কমিশন বয়কট করার ব্যাপারে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যে দৃঢ়তা, সাহস ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে দেশবাসী শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। যাহোক, কমিশন তার কাজ কোনো মতে সমাপ্ত করে ও ১৯৩০ সনে তার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিশনের রিপোর্ট এদেশবাসীর নিকট সন্তোষজনক হয় নাই। জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এ-সম্পর্কে বলেছিলেন: 'We resist the new doctrine to the best of our power. Jalianwala Bag was physical butchery. Simon Commision is the butchery of the soul'—

[আমরা এ-নীতিতে যথাসাধ্য শক্তিতে বাধা দান করছি। জালিয়ানওয়ালা বাগে দৈহিক হত্যার বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়। সাইমন কমিশন আত্মার হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।]

জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা

১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সন পাক-ভারতের ইতিহাসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আলোড়ন, ভাঙাগড়া ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাল। স্যার আব্দুর রহীমের আলীগড় বক্তৃতা, সাইমন কমিশনের নিয়োগ নিয়ে সমগ্র দেশ তখন আন্দোলিত হচ্ছে। এই সময় সাইমন কমিশনের সমালোচকদের জওয়াবে ব্রিটিশের পক্ষ হতে বলা হয় ভারতের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শাসনতান্ত্রিক দাবী উত্থাপিত হচ্ছে না, অথচ সাইমন কমিশনের নিন্দা করা

হচেছ। তারই জওয়াবে নেহরু-রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়। নেহরু-রিপোর্ট রচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু এবং এজন্যই এর নাম 'নেহরু-রিপোর্ট'। নেহরু-রিপোর্ট ১৯২৮ সনে প্রকাশিত হয়। দেখা গেল, মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো সহানুভূতি তাতে প্রকাশ পায় নাই। সবচাইতে নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হল যে, নেহরু-রিপোর্ট মুসলমানের স্বতন্ত্র দাবী অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, রিপোর্ট আরো এক কাঠি উপরে যেয়ে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত আসন বাতিল করে দেয়—শুধু সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশে সংখ্যানুপাতে দশ বছরের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়। সকল মুসলমান নেতা একবাক্যে এর প্রতিবাদ করলেন। জনাব জিন্নাহ্ কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করেন। কংগ্রেসী নেতাদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী মনোভাবের ফলে মুসলিম লীগের ভিতর যে ঘরোয়া কোন্দল চলছিল, তা দূর হয়ে যায়। দিল্লীতে বিভিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক দলের সম্মেলন হয় এবং মুসলমানের দাবী-দাওয়া নূতনভাবে তৈরী করা হয়। জনাব জিন্নাহ্ এই দাবীর তালিকা প্রস্তুত করেন। ইতিহাসে ইহা 'জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা' নামে সুপরিচিত। দাবীগুলি ছিল এইরূপ:

(১) ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে—অতিরিক্ত ক্ষমতা (Residuary power) প্রদেশগুলির হাতে থাকিবে।

(২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সব প্রদেশে সমানভাবে দিতে হইবে।

(৩) সকল আইনসভা ও নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত এবং কার্যকরী প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইবে। কিন্তু কোনো প্রদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু বা সমতার পর্যায়ে ফেলা চলিবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

(৫) বর্তমান সময়ে যেমন চলিতেছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্বাচন সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে চলিবে। তবে কোনো সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে যে কোনো সময় স্বতন্ত্র নির্বাচন পরিত্যাগ করিয়া যুক্ত নির্বাচন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) প্রাদেশিক সীমার পরিবর্তন যদি কখনও প্রয়োজন হয়—পাঞ্জাব, বাংলা ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরুত্ব তার মাধ্যমে নষ্ট করা চলিবে না।

(৭) সকল সম্প্রদায়কে পূর্ণভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা (অর্থাৎ বিশ্বাসের, উপাসনাদি, শিক্ষার স্বাধীনতা) দিতে হইবে।

(৮) কোনো আইনসভায় বা নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানে কোনো সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থের হানিকর বলিয়া যদি মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে কোনো আইন বা প্রস্তাব বা প্রস্তাবের অংশ পাস হইতে পারিবে না।

(৯) সিন্ধু-প্রদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের সমান মর্যাদা দিয়া সীমান্ত ও বেলুচিস্তান শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(১১) যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংগে সংগে মুসলমান সম্প্রদায় যাতে রাষ্ট্রের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত চাকরির ন্যায্য অংশ পাইতে পারে, গঠনতন্ত্রেই তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) মুসলমান ধর্ম, তমদ্দুন, ব্যক্তিগত আইনের রক্ষা এবং শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য শাসনতন্ত্রে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ন্যায্যভাবে সাহায্যের অংশ দিতে হইবে।

(১৩) কেন্দ্রে বা কোনো প্রদেশে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মুসলমান উজীর না লইয়া উজীরসভা গঠিত হইতে পারিবে না।

(১৪) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারিবে না।

জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠে। যুক্ত নির্বাচন মুসলমানের নিকট একটি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে সংখ্যাগুরু হিন্দুর নিকট তার

সুবিচার পাওয়ার কোনো আশা নাই। আইনসভায় তার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব প্রেরণের নীতি সংখ্যাগুরুরা মানতে রাজি নয়। প্রথমতঃ দেখা গেল যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে মোটেই আসতে পারছে না। তারপর যখন কোথাও কোথাও দুই-চারটি প্রতিনিধি হিন্দু-মুসলমানের ভোটের মাধ্যমে আসছেন, তারা হিন্দুরই বশংবদ এবং লোকদেখান মুসলমান মাত্র। সংখ্যালঘু মুসলমান তাদের সত্যিকারের প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায়। স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে দেখে হিন্দু সমাজ বিচলিত হয়ে উঠল। জাতীয়তার পবিত্র অংগন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠছে বলে চীৎকার আরম্ভ হয়ে গেল। এই হিংস্র সর্বভুক মিলিত জাতীয়তার রূপ দেখে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান আতঙ্কিত না হয়ে পারল না। তারা স্বতন্ত্র নির্বাচনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্য আন্দোলন শুরু করল।

চৌদ্দ দফার মধ্যে আরো একটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে গেল। মুসলমান ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিতর সর্বত্র তার স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত করার জন্য বাস্তব ভিত্তিক ও পরিচ্ছন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন, স্বতন্ত্র-নির্বাচন, প্রাদেশিক সীমান্ত পরিবর্তনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ণধর্মীয় স্বাধীনতা, কোনো আইন প্রণয়নের বেলায় যে কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশের মতের অনিবার্যতা, সরকারী চাকরিতে মুসলমানের ন্যায্য অংশ, মুসলিম ধর্ম, তমদ্দুন প্রভৃতির সংরক্ষণ, উজীরসভায় সর্বত্র মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ আসনের ব্যবস্থার ভিতর মুসলমানের বাস্তব-ভিত্তিক প্রস্তাবগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কিছু করতে গেলে আটপৌরে ও মানবিক প্রশ্নের বেলায় সাধারণভাবে সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাই বলবৎ হবে; কিন্তু জাতি ও সম্প্রদায়গত প্রশ্নে এ নীতি অচল। মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন থাকবে, তাদের প্রাদেশিক সংখ্যাগুরুত্ব অপরিবর্তনীয়, সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করার তাৎপর্য হল সংখ্যাগুরু মুসলমান এলাকায় মুসলমানের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিতে হবে। তাদের ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন, শিক্ষা প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপের প্রশ্নই উঠে না। সকল আইনসভায় তাদের নির্দিষ্ট আসন দিতেই হবে। এসব কথার অর্থ ছিল অবিমিশ্র জাতীয়তা নয়, মিশ্র জাতীয়তা। এখানে জাতির ভিতর জাতি এবং দেশের ভিতর

দেশকে ঐক্যের ঠাট বজায় রেখেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জিন্নাহ্র চৌদ্দ দফার ভিতর সোজাসুজি পাকিস্তান ছিল না, পাকিস্তান তখনও বহুত দূরে। কিন্তু পাকিস্তানের ইশারা তাতে ছিল এবং তার রূপরেখার ধরা-ছোঁয়ার খেলা এতে ইতিমধ্যেই সূচিত হয়ে গেছে। ১৯৩০ সনে এলাহাবাদ লীগ সম্মেলনে সভাপতি মহাকবি ইক্‌বালের কথায় একটা সুর একটা ছন্দ ভাষা পেয়েও ভাষা পেতে পাচ্ছিল না। কতকটা স্বপ্নে যেমন সৃষ্টি কথা কয় তেমনই ইকবাল তাঁর ভাষণে কথা বলেছিলেন। ইক্‌বাল বলেছিলেন: অন্ততঃ পশ্চিম ভারতের মুসলমান এলাকা সীমান্ত, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে স্বতন্ত্র দেশ হওয়াই মুসলমানের ভাগ্যের সাধারণ পরিণতি বলে মেনে নিতে হয়। খেয়ালী কবির ভাবোচ্ছ্বাস বলে সেদিন কেউ কেউ তাঁর প্রস্তাবে কান দিয়েছিল, কেউ কেউ তাঁর কথায় একদম কান দেয় নাই। কিন্তু ইক্‌বালের এ ঘোষণায় 'জীবনের মাল্য হতে খসা সৃষ্টিধর্মী বীজ ছিল। ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবেই তা অঙ্কুরিত হয়ে মাথা তুলল। ১৯৩০ সনের পর থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যবর্তী দশটি বছরে স্বতন্ত্র মুসলমান দেশের পূর্বাভাস নিয়ে কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। চৌধুরী রহমত আলী, ডক্টর সৈয়দ আব্দুল লতীফের নাম প্রসঙ্গত প্রথমেই করা যায়।

চৌধুরী রহমত আলী 'পাকিস্তান' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এবং ইহাই চালু হয়। (কথাটিতে P—পাঞ্জাব, K—কাশ্মীর, S—সিন্ধু ও Stan—Beluchistan বুঝান হয়)। এ পরিকল্পনায় বাংলা ও আসামের নাম তখনও ধরা হয় নাই। পরে তাও পাকিস্তানের একই শব্দের আওতাভুক্ত করা হয়।

যা'হোক সরকারীভাবে মুসলিম লীগ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এ উপ-মহাদেশে মুসলমানের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উপস্থিত না করলেও স্থানে স্থানে এ ধরনের আলোচনা ১৯৩০ সন থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। মুসলমানের চিন্তা যে অখণ্ড ভারতের মিলিত জাতীয়তার গোঁজামিলের মাঝে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, তার ইঙ্গিত--ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল। তবে বেশীর ভাগ লোক তখনও একে একটা অবাস্তব কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছুই মনে করত না। ইহাকে বলা হত একদল কাব্যধর্মী রাজনীতিকের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট ফল মাত্র।

এলাহাবাদ থেকে লাহোর

১৯৩০ সনে এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনে মহাকবি ইকবালের বক্তৃতায় পাকিস্তানের যে পূর্বাভাস ছিল, ১৯৪০ সনে তাই হল লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তানের দাবী। আলোচ্য দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা-গুলির মধ্যে হল রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্স, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, সিন্ধু ও উড়িষ্যা প্রদেশের জন্ম, মুসলিম লীগের পুনর্গঠন, কায়েদে আজমের প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নেতৃত্ব লাভ, প্রাদেশিক নির্বাচন ও লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নেহরু-রিপোর্ট মুসলমানকে সন্তুষ্ট করতে পারে নাই। মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন দূরে থাকুক, তাদের কোনো বিশেষ দাবী-দাওয়ার প্রতিই সুবিচার করা হয় নাই। সুতরাং মুসলমান নেহরু-রিপোর্ট সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করল। ১৯৩০ সনে সাইমন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর ভিতর হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মৌলিক কারণগুলির উপর সঠিকভাবে আলোকপাত করা হয়। সাইমন কমিশন স্বীকার করে লয় যে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হল গোড়ায় বর্ণগত, তমদ্দুনগত অর্থগত এবং পৃথক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের নীতি বা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয় নাই। মুসলমান তাকে বর্জন করতে বাধ্য হল।

ফলে, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সাইমন রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পাক-ভারতের জাগ্রত জনমতকে উড়িয়ে দেওয়া বা তাকে পাশ কাটিয়ে অতিক্রম করে যাওয়াকে সঙ্গত মনে করলেন না। বিলাতে ভারতের নেতাদের মতামতের সাথে পরিচিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন। গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব হওয়ার কারণ ছিল তাই।

গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশন হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের নেতাগণকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং কোন্ দল সম্মেলনে প্রতিনিধি মনোনীত করবে—তা নিয়ে কংগ্রেস ও গান্ধীজী ফ্যাকড়া বাধিয়ে তুললেন। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করে বসল। প্রথম দিকে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতেই অসম্মতি জ্ঞাপন

করল। জনাব জিন্নাহ্ জোরের সাথে ভারতের স্বরাজের দাবী সমর্থনও করলেন। ১৯৩১ সনে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। গোলটেবিল বৈঠকেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই সমস্যার সমস্যা হয়ে দেখা দিল। সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। অবশেষে হিন্দুনেতারা ব্রিটিশ উজীরে আজম র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে সালিসী করতে ও একটি রোয়েদাদ দিতে অনুরোধ করলেন। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন 'রোয়েদাদ' ঘোষণা করলেন, তখন তাঁরা ঘুরে দাঁড়ান ও ডিগবাজির অভিনয় করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বললেন যে তারা রোয়েদাদ চাননি, চেয়েছিলেন একটি সিদ্ধান্ত। গান্ধীজীও বেঁকে বসলেন। বিশেষ করে অস্পৃশ্য ও তপসিলী হিন্দুদের স্বতন্ত্র নিবাচন নাকচ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করে বসলেন। ফলে পুণাচুক্তিতে তপসিলী ও অস্পৃশ্য হিন্দুর স্বতন্ত্র ভোটাধিকার গেল বটে, কিন্তু মুসলমানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রোয়েদাদ অনড় হয়েই রইল। কেন্দ্রে ফেডারেশন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে যে শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল (১৯৩৫), তাতে ইন্দো-পাক উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াই বদলে গেল। মুসলমানরা অনেকটা স্বাধীনভাবে তাদের দাবী-দাওয়াকে আইনসভায় রূপ দেওয়ার অধিকতর সুযোগ পেল। যতই দেশবাসীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ত্বরান্বিত হওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল ততই মুসলমান তার অধিকার আদায় ও অধিকার সুরক্ষিত করার দিকে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবীতে যাঁরা দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্যার. এ. এইচ. গজনবীর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে। গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের একটি স্থায়ী সমাধান করার চূড়ান্ত চেষ্টা হয়। কিন্তু সব চেষ্টাই কংগ্রেস ও হিন্দুসভা মনোভাবপন্থী নেতাদের জেদের পাহাড়ে ঠেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তার ফলে মিটে যাওয়া দূরে থাকুক, আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠে। কংগ্রেসের অখণ্ড ও মিলিত জাতীয়তার আক্রমণধর্মী রূপ এবং তার দন্তনখর অত্যন্ত নগ্ন হয়ে উঠে। একটি সাধারণ যোগসূত্র ও মিলন ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য নানাভাবে অনেকেই চেষ্টাচরিত্র করেন; কিন্তু যা

হবার নয়, তা কোনো কালেই হবার নয় একথাই শেষবারের মত যেয়ে দাঁড়ায়।

১৯৩৩ সনে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের আলোচনার ভিত্তিতে হোয়াইট পেপার (White Paper) প্রকাশিত হয়। তার একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি (Joint Parliamentary Committee) হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করেন ও ভারতীয় মতামতও জানবার চেষ্টা করলেন। উক্ত কমিটির রিপোর্টের উপরই ১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস হয়।

জনাব জিন্নাহ্ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সমাঝোতার ভাব আনয়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টার পরিণতিতে একটি কথাই বার বার সত্য হয়ে ধরা দিতে লাগল যে, মুসলমানের সমস্যা সমাধানের পথ ও মিলিত জাতীয়তার পথ এক ও অভিন্ন নয়। সংখ্যালঘু মুসলমানের জাতীয় সত্তার বিলুপ্তিই হবে মিলিত জাতীয়তার পরিণতি। সুতরাং এক জাতীয়তার আত্মহত্যার আমন্ত্রণে ঐতিহ্যবাহী এবং ইতিহাসসচেতন মুসলমান সাড়া দিতে পারে নাই। তাকে রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বাঁচতে হলে তাকে স্বতন্ত্র পথে চলতে হবে এবং তাই সে বেছে নিল। এ-পথ যে মাত্র একটি পরিণতিতেই মুসলমানকে নিয়ে যেতে পারে, সে কথা ১৯৩৫ সনেও অনেকেই ভেবে দেখেন নাই। মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও বিশেষ বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের দাবী ইন্দো-পাক রাজনীতির একটি স্বল্পকালীন ও অস্থায়ী অধ্যায় মাত্র—ইহাই ছিল সেদিন অধিকাংশ লোকের ধারণা। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবেই নির্দেশ করে দিল। দুইজাতি মিলিত হতে পারে কিনা তার বোঝাপড়া গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনায় চূড়ান্তভাবে জানাজানি হয়ে গেল। এলাহাবাদে মহাকবি ইক্‌বালের স্বতন্ত্র জাতীয়-ভূমির আভাস থেকে লাহোরের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবকে বীজ থেকে বৃক্ষের স্বাভাবিক রূপান্তরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মনকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। তিনি এদেশের রাজনীতিতে আর যুক্ত থাকবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ও প্রিভিকাউন্সিলে আইন ব্যবসা

করবেন বলে বিলাতেই থেকে গেলেন। মুসলিম লীগের মধ্যে এসময় ঘরোয়া কোন্দল বড় হয়ে উঠল ও লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। জনাব জিন্নাহ্‌র অভাব এ-সময় তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে জিন্নাহ্ ১৯৩২ সনেই দেশে ফিরে আসলেন এবং তাঁকেই তখন লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হল। জনাব জিন্নাহ্‌র কাজ হল লীগের পতাকা-তলে মুসলমানের ভিতর ঐক্য আনয়ন।

১৯৩৫ সনের আইনের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান এবং তাদের কংগ্রেস ও লীগ কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। কোনোপক্ষই এতে পুরাপুরি সুখী হতে পারে নাই এবং কোনোপক্ষই এতে সব কিছুই বর্জনীয় মনেও করে নাই। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ফেডারেশন প্রস্তাবিত হওয়ায় হিন্দু বা কংগ্রেস ছিল কিছুটা খুশী। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে এর ভিতর তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল অনিবার্য। কিন্তু মুসলমানের ভয়ের কারণ ছিল এখানেই। তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হওয়ায় বাংলা, পাঞ্জাব, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে মুসলমানের সংখ্যাগুরুত্ব অনুভূত হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হয়েছিল। তার সাথে ছিল সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট যখন বিবেচনার জন্য উপস্থিত হল, তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর অসাধারণ পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে পেশ করলেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সমর্থনের প্রশ্নে জিন্নাহ তাঁর দলের সাথে ইউরোপীয় সদস্যদের এবং ফেডারেশনকে বিরোধিতা করতে যেয়ে কংগ্রেসের ভোট তাঁর স্বপক্ষে কৌশলে আদায় করে নিলেন। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানের সম্মতি ও অসম্মতির জয় হল। কায়েদে আজম নেতৃত্ব দিয়ে মুসলিম জনতার ইচ্ছাকে সার্থক করলেন।

যাহোক, দরকষার পর একটি 'ভদ্রলোকের চুক্তি,'—(Gentlemen's agreement)এর ভিত্তিতে কংগ্রেস তখনও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগকে সংগঠন করার কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি বুঝলেন যে, দেশের লোক যতখানি অধিকার পেয়েছে, তাতে সঙ্ঘবদ্ধ ও মিলিতভাবে তার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারলে মুসলমানের

ষোল আনা স্বার্থহানির আশঙ্কা আছে। জিন্নাহ্ ঐক্যের আহ্বান জানালেন।

মুসলিম লীগের পতাকাতলে সে সময় ঐক্য আনয়নের কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। তখন মুসলমান ছিল বহু দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি কংগ্রেসের উপদল হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিল। দৃষ্টান্ত এখানে আহ্রার দল, মোমেন দল, জমায়েতে উলেমায়ে হিন্দ্, ইউনিয়ননিস্ট, খাকসার, লালকোর্তা প্রভৃতি দলের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। সোনার পাথর-বাটির মত আর একটি দল বা নানাদলের বর্ণচোরা কংগ্রেসী ও প্রকাশ্য কংগ্রেসী দলও একটি ছিল। তাদের গালভরা নাম ছিল 'জাতীয়তবাদী মুসলিম' দল। এইভাবে শতধাবিভক্ত মুসলমানকে সব দলাদলি এবং পরিচয় ভুলে জনাব জিন্নাহ শুধু মুসলিম লীগ-পন্থী বলে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তখন সারা ভারতে একটি উর্দু গানের কলি মুখে মুখে ফিরত 'মুসলিম হ্যায়, মুসলিম লীগ মে আও।' প্রসঙ্গত ভারতের ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর কৌতুককর ভূমিকার কথাও এসে পড়ে। ভারতের ঐক্য গোলামির বন্ধনেই ছিল সত্য এবং ভারতের এই ভৌগোলিক ঐক্যের নামে এ গোঁজামিলের প্রবর্তক ছিলেন তাঁরাই। কারণ অখণ্ড ভারতে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে, সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়কে এবং বর্ণের বিরুদ্ধে বর্ণকে উস্কিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'ভাগ করো' আর 'শাসন করো'—নীতির অনুকূল পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন। এ ব্যাপারে হাজার বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের এবং কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একটি মিল ছিল। তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের একপক্ষ ছিলেন খ্রীস্টান এবং অপর পক্ষ ছিলেন তার ধারক। সর্বনাশা আজাদী ও মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদ তাই ছিল তাঁদের উভয়ের চক্ষুশূল। তাই দেখা যায় কায়েদে আজমের মুসলিম ঐক্যের আহ্বানের পথ বহু বাধা ও বিপত্তিতে ছিল আকীর্ণ। লীগ-বিরোধী মুসলমান বর্ণচোরা কংগ্রেসী, প্রকাশ্য কংগ্রেসী এবং অমুসলমানের সাথে কায়েদে আজমকে একাকী লড়াই করতে হয়েছিল এবং মুসলিম ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। লীগ-বিরোধী দলগুলির নাম-নিশানা তাঁর পক্ষে সর্বক্ষেত্রে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু মুসলিম জনজীবন থেকে তিনি লীগ-বিরোধীদের অস্তিত্বকে মুছে দিতে পেরেছিলেন বল্লে অত্যুক্তি

হয় না। কংগ্রেসের ভক্ত ও অনুরক্তদের দ্বারা গঠিত দলের তালিকায় এসব দলের নাম বেঁচে থাকলেও এসব দল ছিল যাকে বলা যায় সেই 'নামেই তালপুকুর, ঘটিও ডুবে না।' ঘটি না ডুবলেও নামের ঘটা এসব দল শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রচার-আনুকূল্যে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন নির্বাচন আসল, তখনই বুঝা গিয়েছিল যে, এসব দল ফাঁকা এবং মুসলমানের দল বলতে একটি আছে এবং তা মুসলিম লীগ।

১৯৩৬ সনে জনাব জিন্নাহর উদ্যোগে বোম্বাই-এ লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন স্যার ওয়াজির হাসান। স্যার ওয়াজির হাসান তাঁর ভাষণে একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। এ উক্তিটি পাকিস্তানের ইতিহাস অনুসরণকারীদের বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখা দরকার। তিনি বলেছিলেন, 'একথা আমাদিগকে মনে রাখতে হবে—ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায় নয়, নানা দিকে তারা দুটি জাতি।' শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের মঞ্জিলে মঞ্জিলে মুসলমান ধাক্কা খেতে খেতে, এ-পথ থেকেও পথ খুঁজে খুঁজে হাতড়িয়ে হোঁচট খেয়ে ভাবতে বাধ্য হল স্বতন্ত্র জাতিত্বকে বেছে নিলেই সত্য ও নিরাপদ পথের সন্ধানী হওয়া যাবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হয়ে এক জাতিত্বের অন্তর্ভুক্তি এবং মিলিত জাতীয়তার সবক হল মিথ্যার সবক। বোম্বাই অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে মুসলিম লীগ সর্বত্র প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ১৯৩৬ সনে মুসলিম লীগ সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হল।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তখন একদল লোক অভিযোগ করেন যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আজাদী-বিরোধিতার মনোভাব নিয়ে লীগ সংগঠিত হচ্ছে। জনাব জিন্নাহ্ এর যে সুন্দর জওয়াব দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর বিবেচিত হবে না। জনাব জিন্নাহ্ সেদিন বলেছিলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার পথকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে না, বরং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তারা সংগঠিত হচ্ছে। আটকোটি মুসলমান যদি শক্তি সঞ্চয় করে, তারা আজাদী সংগ্রামে হিন্দুকে অনেকদূর সাহায্য করতে পারবে, তাছাড়া স্বাধীনতা যখন আসবে, তখন তাদের ক্ষুঁদকুঁড়া দিয়েও সন্তুষ্ট করা যাবে না এবং তাদের উপেক্ষা

করাও সম্ভবপর হবে না। সুতরাং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানকে একতাবদ্ধ করার এই আকুল আবেদন।'

লাখনৌতে ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন বসল মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে তা প্রভাতী তারার বার্তা বয়ে এনেছিল। মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংহত মুসলমানের নূতন চলার দৃপ্ত পদক্ষেপ লাখনৌ থেকেই শুরু। ১৯১৬ সনে লাখনৌ সম্মেলন মুসলিম লীগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৩৭ সনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল। নব পর্যায়ে লীগের ইতিহাসে তখন থেকেই তার জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল। এ ইতিহাসও অবিস্মরণীয়।

১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইনের ফেডারেশনের ভীতি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের অধিকারের পশ্চাদ্ভূমিতেই লাখনৌ সম্মেলনের অধিবেশন বসে। আজাদীর অদূরবর্তিতা এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকারের রূপরেখা অস্পষ্টতার কুয়াসা ভেদ করে মাথা তুলেছে। এ অবস্থায় মুসলমানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে একতা চাই। এই একতার পথেই কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানকে সেদিন ডাক দিলেন। একতার এ আহ্বান ছিল দুর্জয় ও অন্তর্ভেদী। অনৈক্যের বিরোধ-বিভেদের পাহাড়-পর্বত ঐক্যের আহ্বানে ধসে পড়তে লাগল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। কৃষক-প্রজা দলের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক্, পাঞ্জাবের ইউনিয়ানিস্ট দলের গৌরবচূড়া স্যার সেকেন্দর হায়াত প্রমুখ নেতা একের পর একজন কায়েদে আজম জিন্নাহর পশ্চাতে লীগের শামিয়ানাতলে শামিল হলেন। মুসলিম লীগের শক্তি দুর্জয় হয়ে উঠল। সিন্ধু ও সীমান্তে লীগ-বিরোধী শক্তি কিছুটা মাথাচাড়া দিয়ে কিছুদিন থাকলেও আস্তে আস্তে তা নতি স্বীকার করল। লীগের পতাকাতলে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের উজীরে আলা, উজীর ও নেতারা ঐক্যের সমতল ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন। লীগের লাখনৌ অধিবেশন থেকে মুসলিম ভারতে ঐক্যের যে বিপুল যাত্রা শুরু হল, তার নজীর নাই। ঐক্যের এক নবতর প্লাবনে সকল বাধা-বিরোধ কোথায় যে ভেসে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। ঐক্য হতে শক্তি আসে এবং শক্তিশালী দলই সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মুসলিম লীগ

যে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান রূপে শীঘ্রই দেখা দিতে পারবে, সে লক্ষণও লাখনৌ থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

ভারতীয় কংগ্রেস এতে শুধু প্রমাদ গণল না, বিচলিত হয়েও উঠল। শক্তির দম্ভে কংগ্রেস লীগকে অস্বীকার করে চলবার এক প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করে দিল। কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর একটি বিবৃতিতে তৎকালীন কংগ্রেসী মনোভাবের প্রতিধ্বনি পরিষ্কার-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতজী বললেন, 'ভারতে শুধু দুইটি দলই আছে। তা-হল কংগ্রেস ও ব্রিটিশ'। নব সঞ্চয়িত শক্তির উপর আস্থা রেখে ও ভরসা করে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সঙ্গে সঙ্গেই জওয়াব দিলেন, 'ভারতে দুটি দল নয়—তিনটি। ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ'। কংগ্রেস মুসলিম লীগের মাথা ডিঙিয়ে মুসলিম জনগণের নিকট পৌঁছবারও তখন চেষ্টা করে। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম গণসংযোগের এ-হানুমানিক কসরত ব্যর্থ হয়।

১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস গান্ধিজীর উপদেশ অনুসারে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে একটি 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করে ও প্রাদেশিক উজীর সভা গঠন করে। এ-সময়েই কংগ্রেসের অনমনীয় জেদের রূপ পুরাপুরি প্রকাশ পায়। কংগ্রেসী না হলে কোন মুসলমানকে উজীর সভায় স্থান দিতে কংগ্রেস অনিচ্ছা জানায়। লীগ, লীগনেতা, লীগের ওজারত ও উজীরদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের বিদ্বেষ তীব্রতর, বিপুলতর ও ব্যাপকতর হয়ে উঠে। কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমানের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে পড়ে। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহাকবি ইকবাল জনাব জিন্নাহ্কে যে পত্রটি লিখেন, তা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। তিনি লিখেনঃ 'অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমার ধারণা জন্মেছে যে, মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হলে তার পৃথক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করে তাদের শরিয়তে উন্নতি বিধান করতে হবে। ইহা ব্যর্থ হলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। আমার মতে প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানের পক্ষে ইহাই হবে বিকল্প ব্যবস্থা।' সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী শাসনের ব্যর্থতা ও মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রম লাখনৌ লীগ সম্মেলনের নীতি ব্যাখ্যায় অনেকখানি প্রভাব

বিস্তার করেছিল, কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক মিলিত জাতীয়তার নীতি মুসলমানের প্রতিরক্ষামূলক মনোভাবেও নূতন দৃঢ়তা এনে দেয়।

লাখনৌতে একতাবদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগ রাজনীতির যে গোড়াপত্তন, সে রাজনীতির পরবর্তী স্তর হল সংগঠনাত্মক কার্যক্রম। লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন তখন ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সংগঠনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। একদিন ছিল মুসলিম লীগ বড় বড় শহরের অলস ও সরকার প্রসাদলোভী খয়েরখা ধরনের রাজনীতিকদের প্রতিষ্ঠান। শহরের ভিতরই তার অস্তিত্বের খবর এক একটা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেত। ১৯৩৭ সনের পর থেকে লীগ আন্দোলনের সামগ্রীক রূপ ও প্রকৃতি বদ্‌লে গেল। দেশের সর্বত্র লীগের ইউনিট গড়ে উঠল। এবং তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যকলাপের ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা সংগ্রামী রূপ। মুসলিম লীগ যে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান রূপে শীঘ্র শক্তি পরীক্ষায় নামবে, এ ধারণাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

এরই সাথে চলতে লাগল সঠিক পথের সন্ধান এবং লক্ষ্য-ভূমি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ও খোঁজাখুঁজি। অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে মুসলমানের মনে দেখা দিল। অখণ্ড ভারতে বর্ণাশ্রমী হিন্দুর সাথে তামদ্দুনিক সমন্বয় সাধন করে একজাতি হয়ে বাস করার আশা আগেই বর্জিত হয়েছিল। স্বাতন্ত্র্য ও রক্ষাকবচ নিয়ে তার সাথে পাশাপাশি সহ-অবস্থানের প্রস্তাবও গৃহীত হল না। ইকবালের স্বপ্ন, চৌধুরী রহমত আলীর পরিকল্পনা, ডাঃ সৈয়দ লতীফের প্রস্তাবিত ফেডারেশন ছাড়াও আরও কয়েকটি পরিকল্পনা ও মুসলিম চিন্তার অনুকূল আবহাওয়া যথেষ্ট প্রচার লাভ করল।

১৯৩৮ সনে পাটনায় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সে সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মুখে এবং লীগ নেতাদের মুখে ছিল ঐক্য, সংহতি এবং সংগঠনের বাণী। আর এরই সাথে সাথে বার বার ঘোষিত হতে লাগল যে, মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সুবিচার না করে কোন শাসনব্যবস্থা এ উপমহাদেশে চালু করা কারো পক্ষে সম্ভাবপর হবে না। যদি জোর করে তাদের উপর কোনো কিছু চাপাবার চেষ্টা হয়, তবে মুসলমান তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। আর

এ অবস্থায় দশকোটি মুসলমানের ন্যায়সম্মত অভিযানের মুখে অবাঞ্ছিত কোন ব্যবস্থাই টিকবে না। প্লাবনের মুখে বালির বাঁধের মত তা ভেসে যাবে। নব-সংহতির সে দুর্জয় বন্ধন এমন করে মুসলমানের মধ্যে আস্তে আস্তে গ্রন্থির পর গ্রন্থি রচনা করে যে সংহতি গড়ে তুলেছিল, এ উপমহাদেশের ইতিহাসে তা সত্যই ছিল নজীরবিহীন। ১৯৩৮ সনের জুন মাসে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক বসে। কতকটা চরমপত্র প্রদানের ভংগীতে মুসলিম লীগ জানিয়ে দিতে বাধ্য হল যে, মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে যদি স্বীকার না করা হয় তবে স্বাধীনতা প্রশ্নের কোনো আপোস-মীমাংসাই মুসলমানের নিকট গ্রাহ্য হবে না। এ-ভাবেই ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় মুসলিম লীগের আচরণে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকায় ব্রিটিশ শাসক, কংগ্রেসী নেতা এবং অখণ্ড ভারতের সকল নিশান-বরদারদের মহা দুর্ভাবনার কারণ ঘটল। এ দাবীর নির্গলিতার্থ ছিল ভারতের রাজনীতি যে প্রধানতঃ মুসলমান ও হিন্দুর স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এক নয়, দ্বিধাবিভক্ত-এ যুক্তি মেনে নিতে হবে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছা তাঁরা কোনো দিন গোপন করেন নাই। তবে তাঁরা এ-প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোস রফার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কতকটা নিরপেক্ষ ভূমিকার ভাব প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। যাহোক, কংগ্রেস মুসলিম লীগের সার্বিক মুসলমান প্রতিনিধিত্বের দাবী মেনে নিল না। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মধ্যে এনিয়ে আলাপ ও পত্রালাপ চলল। কিন্তু অচলাবস্থার প্রতিকার অজানাই রয়ে গেল। রাজনৈতিক ঘটনা প্রভাবের চক্র এমনভাবেই ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর আবর্তিত হয়ে চলল যে, স্বতন্ত্র দেশ, জাতি ও উপমহাদেশ বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জিন্নাহ্‌ যেন একটা অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে তৈরী হতে লাগলেন।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠল। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো সার্থক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জনাব জিন্নাহ্‌ ও গান্ধীজীর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। কংগ্রেস বেঁকে বসল। তারা এ যুদ্ধের ব্যাপারে ব্রিটিশের একতরফা নীতিনির্ধারণ ও পদক্ষেপ, ভারতের সম্মতি না নেওয়া এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা না করায় একে 'জনযুদ্ধ'

(Peoples war) বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। মুসলিম লীগ ব্রিটিশের এ-সঙ্কট সন্ধির পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইল না। লীগ মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দাবীতে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার ইচ্ছা জ্ঞাপন করল। ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রশ্নে বিনাশর্তে স্বাধীনতা সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে যেখানে ছিল সুবিধাজনক, সংখ্যালঘু মুসলমানের পক্ষে তা ছিল বিপজ্জনক। মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় রক্ষকবচ মুসলমানের নিকট স্বাধীনতার সমার্থক ও অভিন্ন প্রশ্ন ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাই ছিল সংখ্যাগুরু হিন্দুর নিকট প্রধান আবেদন। কংগ্রেসের দাবীর প্রতিক্রিয়া আশানুরূপ না হওয়ায় ও ভিন্ন হওয়ায় কংগ্রেস যে সব প্রদেশে ওজারত গঠন করেছিল, সে সব প্রদেশের ওজারত ও শাসনভার বর্জন করল। আড়াই বছর কংগ্রেসী ওজারতের একটি বড় কলঙ্ক ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কংগ্রেসী ওজারতের নিষ্ক্রমণে সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশের মুসলমানরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। মুসলিম লীগের উদ্যোগে এজন্য 'নাজাত দিবস' পালিত হল। লীগ-কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতি আরো এক ধাপ নীচে নেমে আসল। লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি আজাদীকে অন্যতম লক্ষ্য বলে স্থির রাখলেও তাদের যাত্রাপথ পুরাপুরি বিপরীত মুখে পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগল।

সার্থক যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধোত্তর শাসনতন্ত্র, মুসলমানের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মুসলিম লীগের তরফ থেকে বড়লাটের নিকট একটি পত্র প্রেরিত হয় এবং জিন্নাহ্-বড়লাট সাক্ষাৎকারেরও একটা ব্যবস্থা হয়। বড়লাট পত্রের উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার সময় মুসলমানের সম্মতি এবং নিরুদ্বিগ্ন সহযোগিতার দায়িত্ব সম্পর্কে গবর্নমেন্ট সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। বড়লাটের এ-প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের যথেষ্ট মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেসের লীগ-বিরোধী প্রচার আরও জোরদার হয়ে উঠল এবং ভারতের বাইরে এ অপপ্রচার শক্তি সঞ্চয় করল যথেষ্ট। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ অনড় রইলেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তাঁর যুক্তি বিশ্লেষণ করে প্রতিপক্ষের সকল আপত্তি, প্রতিবাদ ও প্রচারকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। এ-উপমহাদেশের আজাদীর পন্থা কি, সহ-অবস্থান সম্ভব না হলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান কি হতে পারে, এটা হয়ে দাঁড়াল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

একত্র না থাকতে পারলে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং রূঢ় বাস্তব বলেই যেমন 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'-এর নীতিকেই গ্রহণ করতে হয়, সে কথাও তিনি এবং অন্যান্য লীগ নেতা চিন্তা করতে লাগলেন। পাল্টা মুসলিম আবাসভূমির পরিকল্পনা এ-আবহাওয়ায় ও পরিবেশে নূতন জীবন পেল। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির ঘন ঘন হাতছানি মুসলমানদের সম্মুখে নবদিগন্তের আলো জ্বেলে ডাক দিয়ে যেতে লাগল।

১৯৪০ সনে লাহোরে লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এ-ভাবনা-চিন্তার পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানের প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয়ে গেল। সারা উপমহাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রদেশের মুক্তির চিন্তা সকলের কল্পনায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত দুনিয়ার কাছে এবং 'সব পেয়েছি দেশের' ন্যায় মুসলমানের নিকট পাকিস্তান এক মহাভরসার বার্তা নিয়ে এল। যারা ছিল একটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দীনদরিদ্র উপেক্ষিত সম্প্রদায় তারা কোনো এক অভাবিতপূর্ব যাদুস্পর্শে রাতারাতি হয়ে গেল জাতি। তার আদর্শ, ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য ও সংহতির ইতিহাসে তার জাতিভিত্তিক নবপরিচিতির উপর নবদিগন্তের আলোকধারা নেমে এল। পুরাতন মুসলমানকে নূতন জানাজানির মাধ্যমে সকলে দেখতে লাগল। এ-নূতন জাতির নূতন আবাসভূমির দাবীতে মুসলমান মুখর হয়ে উঠল।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের দাবী পুরাতন চিন্তার বদভ্যাসে করল প্রচণ্ড আঘাত। প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারতকে যারা অখণ্ড ভাবতে যুগ যুগ ধরে শিখে এসেছিল, ভারতের অখণ্ডত্বকে যারা সযত্নে লালন ও পোষণ করে এসেছিল; তাদের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব অসহ্য মনে হল। তারা একে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন বলে গালি দিতে লাগল। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের মিলিত জাতীয়তার সাধনায় রত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এই অখণ্ডত্বকে ভিত্তি করেই এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তাদের সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই মুসলিম লীগের যুক্তিতর্কের লড়াই ও চিন্তাধারার সংঘাত শুরু হল। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের এ অধ্যায়ে একদল চিন্তাজীবী ও মনীষাসম্পন্ন সাহিত্যিক সমাজ যে কাজ করেছিলেন,

তার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এদের মধ্যে প্রবন্ধকার, কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীও ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় পাক-ভারতের নানাস্থানে পাকিস্তান-বাদের কয়েকটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পত্তন হয়। তাঁদের দান সত্যই বিপুল। প্রসঙ্গত কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। মুসলমান সংবাদপত্রগুলিও পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার কাজে অনেকখানি মদদ করেছিল। বাংলা খবরের কাগজের ভিতর 'আজাদ'-এর কথা প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ না করে পারি না। ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ডন' (তখনও দৈনিক হয় নাই)।

যাহোক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মঞ্চ থেকে পাকিস্তানী ভাবধারার প্রচার মুসলমানের চিন্তারাজ্যেও এনে দিল একটি প্রবল যুক্তিবাদী শক্তি। একে চিন্তা-বিপ্লব বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

—মুজীবুর রহমান খান

সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী

ভারতীয় মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর একটি প্রধান ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব। উত্তর ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রধান উদ্গাতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের লাখনৌর এক সভায় হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি একথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে এই দুটি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দূরত্ব স্পষ্টতর হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫-তে, মুসলমানরা কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায়, ১৯০৬ সালে। শুরুতে কংগ্রেস ও লীগের ভেতর উদ্দেশ্যগতভাবে এক বিষয়ে মিল ছিল ; উভয় প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের ভেতর শাসকদের প্রতি আনুগত্য গড়ে তোলা। বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমাকীর্ণ পতনবন্ধুর যাত্রাপথে সংগঠন দুটি ক্রমান্বয়ে শাসকদের পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতার নিকটবর্তী হতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে এক হয়ে যেতে পারেননি। তাদের প্রবাহ ছিল সব সময়েই কমবেশী সমান্তরাল। তার কারণ স্পষ্টতঃই এই যে, মুসলিম সংখ্যালঘু হিন্দু সংখ্যাগুরুকে ভয় না করে পারেননি। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার কথা বলতেন সেখানে ভারতীয় মুসলিম নিজের জন্য নতুন এক পরাধীনতার নিগড় দেখে শিউরে উঠেছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এই ভীতির কারণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব রূপে বিরাজ করছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক তার পরের বছর এবং লীগ-আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে বাংলা দেশ আবার দ্বিধাবিভক্ত হয় ১৯৪৭-এ। মধ্যবর্তী ৪২ বছরের ইতিহাস একাধারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জনের ব্যর্থতা ও এদেশে ইংরেজ শাসনের অসম্ভবতা উপলব্ধিরই ইতিহাস।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী সংলগ্ন বিভিন্ন বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের মুসলিম লেখকগণ যেভাবে বিচার করেছেন তার খতিয়ান বহুবর্ণ রঞ্জিত ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং এমনকি শিক্ষণীয়ও বটে। বর্তমান

রচনা কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে তেমনি একটি খতিয়ান তৈরীর চেষ্টা মাত্র। সময় ও স্থানের স্বল্পতার কারণে বিবরণ স্বভাবতঃই খণ্ডিত। কলকাতার 'মাসিক মোহাম্মদী,' 'সওগাত' ও 'বুলবুল' ঢাকার 'শিখা' ও 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী' এবং সিলেটের 'আল ইসলাহ' থেকে এই খতিয়ানের উপাদানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের 'মোহাম্মদী' মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখপত্র বলে গণ্য হবার যোগ্য; 'আল ইসলাহ্'ও তাই, 'সওগাত' 'মোহাম্মদী'র চেয়ে কিছুটা কম রাজনৈতিক ('শনিবারের চিঠি' 'সওগাতে'র তুলনায় 'মোহাম্মদী'কে নিয়েই বেশী মাথা ঘামাতেন); 'বুলবুল' রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; 'শিখা' মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ও মূলতঃ স্বীয় সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় সম্মোহনের স্থলে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা-কল্পে নিয়োজিত এবং 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের চিন্তাধারার পরিচয়বহ। অতএব সাময়িকীগুলোর ভেতর সাদৃশ্য যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি অনুপস্থিত নয়; 'মোহাম্মদী' ও 'আল ইসলাহ' দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে পরস্পর সন্নিকটবর্তী বটে, কিন্তু প্রথমটি বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয়টি আসাম প্রদেশস্থ সিলেটের পত্রিকা। সে হেতু তাদের বক্তব্যের ভেতর কিছু ব্যবধানও লক্ষ্য করা যাবে।

॥ এক ॥

যে জিজ্ঞাসাটি লেখকদের সবচেয়ে বেশী আন্দোলিত করেছে সেটি দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দূরত্ব, বিরোধ ও সংঘর্ষ বিষয়ক। উত্তরে নির্দেশিত কারণগুলোকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। এক, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য, দুই, মুসলমানকে জানার ব্যাপারে হিন্দুর অনাগ্রহ এবং তিন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অসহিষ্ণুতা।

সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি দুই ধর্মের মূলগত পার্থক্য। এ পার্থক্য নানাভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন,

> 'যে কোন ইসলাম-অভিজ্ঞ ব্যক্তি একথা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি অনৈসলামিক, কেননা

ইহা আদ্যোপান্ত পৌত্তলিক চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট।... যে সঙ্গীতে দুর্গা মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশপ্রেম রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে একেশ্বর-বাদী মুসলমান জাতীয়-সঙ্গীতরূপে কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারে না।'

[ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, 'বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন সমস্যা' ; 'বুলবুল,' ফাল্গুন ১৩৪৩]

অথবা

...আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মনে রাখা উচিত, হিন্দুদের মধ্যে যারা খৃস্টান হচ্ছে তারা নাম বদলায় না, ধর্মমতই শুধু বদলায়। আচারে ব্যবহারে রয়ে যায় তারা হিন্দুদেরই মতো, যেমন চীনদেশে হয়েছে মুসলমানদের অবস্থা।...কিন্তু এদেশে মুসলমান যারা হয়েছিল তাদের পরিবর্তন হয়েছিল প্রচুর।...

[সৈয়দ এমদাদ আলী, 'হিন্দু মুসলিম,' 'বুলবুল,' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩]

কিন্তু ভিন্নতর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে,

আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৬ই নভেম্বর—সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। সেদিন মৌলবী কামালউদ্দীন 'অর্থনৈতিক কলহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলতে প্রয়াস পেয়েছেন আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ পরস্পরের অর্থনৈতিক অনৈক্য, ধর্ম বা সামাজিক বিভিন্নতা এর কারণ নয়;...

[মুসলিম সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী ; 'শিখা,' ১৩৩৮]

এবং

ব্রিটিশ বণিকেরা মুসলমানদের বদান্যতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রতিপত্তি লাভ করতে করতে রাজত্ব লাভ করলেন। তারপর মুসলমান ক্ষোভে অভিমানে বহুদিন নূতন রাজশক্তির সাথে সাহচর্য না করে দূরে সরে রইল; কিন্তু দুনিয়া এগিয়ে চলল। তারপর হঠাৎ যখন জেগে উঠল তখন সে দেখে—হিন্দু সমাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তখন সে তার অনুকরণে প্রবৃত্ত হল।

[আবুল হুসেন 'আমাদের রাজনীতি', 'শিখা', ১৩৩৮]

অর্থাৎ সেও বলল আমাকে চাকুরি দাও। এবং তখনি বাধল বিরোধ। এমনকি যাঁরা মনে করতেন পাকিস্তান হবে বা তার হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাঁরাও বলেছেন,

বর্ণাশ্রম ও বুর্জোয়া শ্রেণী এই দুয়ের শুভ-মিলনে হিন্দু ভারতে সমাজতন্ত্রের পথ চিরতরে রুদ্ধ হওয়াও আশ্চর্য নয়। মুসলিম সমাজে উক্ত অন্তরায়ের একটিরও অস্তিত্ব নেই। মুসলমানদের জাতীয় ধর্ম ইসলাম সমাজতন্ত্রের বিরোধী ত' নয়ই, বরং ইসলামকে সমাজতন্ত্রের সমর্থক ও পথ প্রদর্শক বললেও অত্যুক্তি হবে না।

[তালেবুর রহমান, 'আমাদের সংখ্যা-লঘু সমস্যা' ; 'মোহাম্মদী,' ফাল্গুন, ১৩৫০]

এবং

...এ ছাড়া আরও কথা এই যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দিকে আরবীয় ইসলামের যেরূপ সুস্পষ্ট প্রবণতা রহিয়াছে, তাতে পাকিস্তান চালকরা ভালো মুসলমান হইলেই সমাজতন্ত্র সহজে আসিবার পথ পাইবে। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে রাজনৈতিক চিন্তার পশ্চাতে ধর্ম-সামাজিক অনুভূতি থাকিলেই তার সংগে সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার একটা বিরোধ কল্পনা করা ঠিক নয়।

['সাময়িকী,' 'সওগাত' বৈশাখ, ১৩৫৪]।

'সওগাতে'র এই সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় অবশ্যি 'বুলবুল' ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক পার্থক্য সৃষ্টিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন,

অথচ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম সংহতির বাণী উচ্চা.ণ করিয়া যাঁহারা আজ হাতের নিশান সঘন আন্দোলিত করিতেছেন, তাঁহাদের পুরোবর্তীরা সকলেই জমিদার, মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের ফলে, মুসলিমদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে আতঙ্কিত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলিম জমিদার, মহাজন

ও ধনিকেরা তাঁহাদের শ্রেণীগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা, খাতক ও শ্রমিকদের প্রবল আন্দোলন যাহাতে জাগিয়া উঠিতে না পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। সমস্ত মুসলিম নেতাকে সকল প্রশ্নে সকল সমস্যায় সমমত হইয়া কার্য করিবার উদ্দেশ্যে একটি মাত্র মুসলিম দল প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহাদের এই ইচ্ছাটি লুকাইয়া আছে, এ কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

['কলস্রোতা,' 'বুলবুল', কার্তিক, ১৩৪৩]

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মুসলমানদেরই দাবী ছিল। এই প্রশ্নটিকে 'জমিদার, মহাজন ও ধনিক' শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবার জন্য মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন, এটাই 'বুলবুলে'র সন্দেহ। 'আইনতঃ এবং কার্যতঃ মুসলিম প্রজার সহিত হিন্দু জমিদারের ও মুসলিম জমিদারের সম্পর্কে কোন পার্থক্য নাই' সুতরাং সংগঠন হওয়া উচিত শ্রেণী-ভিত্তিক, ধর্ম-ভিত্তিক নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে অর্থনৈতিক স্বার্থচেতনা ঘটনার নিয়ামক হয়ে দেখা দেয়নি, বা দিতে পারেনি, এবং 'বুলবুল'ও পরোক্ষে সেই সত্যকেই মেনে নিয়েছেন যখন এর ঠিক এগার মাস পরেই মন্তব্য করেছেন,

গত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত লাক্ষ্ণৌ শহরে মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।...মুসলিম লীগের জন্ম হইয়াছে আজ ত্রিশ বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজের এইরূপ প্রাণের পরিচয় আর কখনো পাওয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ।... এতদিন লীগ রাজনীতি যাঁহাদের নিকট বিলাসের সামগ্রী, ঐ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দেরই সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল। এবার হইতে ইহাতে মুসলিম জনসাধারণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইল। এবার লীগের আদর্শ হইয়াছে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহার গঠন-তন্ত্রকে করা হইয়াছে গণ-সংযোগের উপযোগী।...

মূলনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব লীগের অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলেন মৌলানা হসরৎ মোহানী সাহেব। এই বিষয়ে একটি কথা লক্ষ্যযোগ্য এই যে, কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে মৌলানা সাহেব পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন—

গান্ধীজীর বিরোধিতায় তাহা গৃহীত হয় নাই। কংগ্রেস কয় বৎসর আগে যাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই মুসলিম লীগ আজ তাহা গ্রহণ করিলেন।

লাক্ষ্ণৌ সম্মিলনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার গণ-সংযোগ। পূর্বেই বলিয়াছি এতদিন মুসলিম লীগ ছিল নবাব-সুবাদের প্রতিষ্ঠান। এইবার—লীগের ত্রিশ বৎসরের জীবনে এই প্রথম, লীগ ভারতের আট কোটি মুসলমানকে নিজের পতাকাতলে আহ্বান করিল।...

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইলে চলিবে না, লীগ ঘোষণা করিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য লীগ সংগ্রাম করিবে।

['বুলবুল', কার্তিক, ১৩৪৪]

এটি সেই সময়ের ঘটনা যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক, আসামের সাদুল্লাহ এবং পাঞ্জাবের সেকান্দর হায়াত খান কায়েদে আজমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। বোঝা যায় উপরি-উক্ত অভিনন্দন এই নতুন নেতৃত্বের প্রতি এবং এই নেতৃত্বের অভাবই ছিল পূর্বের সমালোচনার প্রধান হেতু। এই মনোভাবের সঙ্গে কংগ্রেসের নিম্নরূপ সমালোচনার তুলনা করা চলে—

কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ দুইই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এমন কতগুলো জিনিস এর ভেতর পাওয়া যায় যার ফলে মুসলমানদের সহযোগিতা কংগ্রেস কিছুতেই আশা করতে পারে না।

[সম্পাদকীয়, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৩৪৫]

এক্ষেত্রেও অভিযোগ কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভাপন্থীরা সমাসীন, সুতরাং

কংগ্রেসের মুসলিম গণসংযোগের ফলে আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তাতে মুসলমানদেরই ক্ষতি।...

[ঐ]

তাহলে বোঝা যাচ্ছে শুধু ধর্ম নয় অর্থনৈতিক অসাম্যও যে হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের পেছনে কার্যকরী এইরকম একটা চেতনা মুসলিম লেখকদের মনে উপস্থিত ছিল। যেন একজন শিক্ষকের উক্তি,

> অর্থ ও সম্পদের সংস্থান চাই-ই। তার জন্য যতগুলো পথ আছে, ধর্মে যা কিছু গ্রহণযোগ্য বলেছে—তার প্রতিটি ক্ষেত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, চাকরি-নকরি, অর্থাৎ যাতে অর্থ-সমাগমের সম্ভাবনা আছে সবই।...ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যতটা সম্ভব বজায় রাখতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে জাতীয়তা-উদ্বোধক Buy Muslim মন্ত্র।
>
> [মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস বি-টি, চিন্তাধারা, 'মোহাম্মদী' মাঘ, ১৩৫০]

এই সঙ্গে এমন মতও শোনা গেছে যে ধর্ম এক হলেও সংস্কৃতি এক হবে এই রকম কোন নিশ্চয়তা নেই,

> গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জন্ম। গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে, সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে: কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে-সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ্দ। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা। এই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।
>
> [আবুল মনসুর আহমদ মূল সভাপতির অভিভাষণ, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন, 'মোহাম্মদী', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১]

পূর্ব পাকিস্তানীদের উল্লিখিত স্বাতন্ত্র্যের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এ সম্মেলনের তাহজীব ও তমদ্দুন-শাখার সভাপতির অভিভাষণে:

> বাংলা ও আসামের প্রকৃতিতে ও ভৌগোলিক আবেষ্টনে যে-স্বাতন্ত্র্য আছে, তা ভারতের আর কোন এলাকায় দেখা যায় না। এমনকি, তার এ স্বকীয়তা তামাম মুসলিম জাহানের পশ্চাদ-ভূমিতে ফেলে বিচার করলেও তা নির্ভুল সীমারেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলা ও আসামের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর ও জলা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই এবং মুসলিম জাহানেও তা বিরল।
>
> [মুজীবুর রহমান খাঁ, 'মোহাম্মদী', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১]

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের কারণ শুধু ভৌগোলিক নয়। তুর্কী ঘোড়সওয়ারদের বাংলাদেশে আগমনের অনেক আগেই সাগর পথে 'আরব সওদাগরেরা' এ দেশে এসেছেন এবং এসে 'সুজলা সুফলা বাংলায় মুসলিম তমদ্দুনের গোড়াপত্তন' করেছেন। পরে পাঠানরা

> যখন বাংলায় এল, তখন আরব-বাঙালীর সমন্বয়ে বাংলার স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী পরিবেশ বিশালভাবেই গড়ে উঠেছে। পাঠানরা তাকে অল্পবিস্তর মেনে নিতে বাধ্য হল। এতে করেই এল বাংলার সাহিত্যে ও স্থপতিতে এক মহান নবযুগ।...পাঠানদের বাংলা ভাষা-প্রীতিতেই নয়, পাঠানযুগের স্থপতিতেও দেখি সর্বত্র বাঙালীর স্বকীয়ত্বের বিজয়-ঘোষণা।
>
> [ঐ]

ওয়াহাবী আন্দোলের স্বরূপ সম্পর্কে সভাপতির মত,

> বাংলার এই আরবী শিক্ষিত ওয়াহাবী-পন্থী আলেমরা দু'ধারী তলওয়ার চালালেন। কোরআনের পথে মুসলমানকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ছেড়ে সংস্কৃত হওয়ার আহ্বান যেমন জানালেন, ঠিক তেমনই তাঁরা উর্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের সাহিত্য-জীবনে বাংলা ভাষাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অর্থাৎ বাংলার মুসলিম সংস্কৃতিতে 'বিকৃত ইসলামের বাহক সাম্রাজ্যবাদী মোগল' কোন সুদূরপ্রভাবী অবদান রেখে যেতে পারেননি। অন্য দিকে হিন্দুধর্ম যেহেতু 'বর্ণাশ্রমী প্রতীকবাদী', সুতরাং

...চিরকালের প্রতিবেশী হিন্দুর সাথে মিলের প্রচুর অবসর থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারের আঁক কষলে বাঙালী মুসলমানের তাহজীব ও তমদ্দুনে হিন্দুর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

[ঐ]

সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি মন্তব্য করেছিলেন,

পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যেমন ভাষাবিজ্ঞানে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে উর্দু ভাষা, সেইরকম পূর্ব ভারতে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বাংলা ভাষা। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যেমন মুসলমানরা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে উর্দু ভাষা সৃষ্টি করেন, সেইরকম বাংলায় মুসলমানরা নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই বাংলাভাষার সৃষ্টি করেন এবং সর্বতোভাবে তার উন্নতি সাধন করেন।

[আব্দুল মওদুদ, 'মোহাম্মদী', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১]

অথচ স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু কি বাংলা এ নিয়ে এক সময়ে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল।

বাঙালা মুসলিমের মাতৃভাষা কি হইবে, ইহা লইয়া গত কয়েক বৎসর হইতে একটি আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। গত হার্টগ কমিশনের তদন্তের সময়ও ইহা লইয়া মুসলিম সমাজ ও সংবাদপত্র মহলে একটা বাদানুবাদ চলিয়াছিল—

[দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, 'আমাদের মাতৃভাষা', আল্ ইসলাহ্', শ্রাবণ, ১৩৪০]

উক্ত লেখকের মতে,

বাংলা ভাষাই বাংলার মুসলিম সমাজের মাতৃভাষা হওয়াই স্বাভাবিক এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা লইয়া আলোচনা করা প্রথমতঃ হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়, আর আমাদের মুসলিম তরুণেরা ফরিয়াদীর জবানবন্দী না শুনিয়াই একতরফা মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন, কিন্তু দরদী প্রাণ লইয়া সহানুভূতিভরে মুসলিম সমাজের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে

> হাসিবার কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুসলিমের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সহিত এই মাতৃভাষা সমস্যাও বিশেষভাবে জড়িত।
>
> [ঐ]

কথাটা সত্যি। অভিযোগটা এই যে, 'সিন্ধুবাদের দৈত্যের ন্যায় বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা আমাদের কৌমী জিন্দেগীর শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই গয়ের ইসলামী সাহিত্য দূর না করা পর্যন্ত মুসলিমেরা আর কখনও বাঁচিয়া উঠিতে পারিবেন না।'

অভিযোগের যথার্থতা সকলেরই জানা। কিন্তু শুধু অভিযোগ নয়, সেই সঙ্গে অভিমান এবং হীনমন্যতাবোধও কার্যকরী ছিল। যেহেতু এ ভাষায় আমার মুখের দিনানুদৈনিক জীবনের কথোপকথনের শব্দ, রূপক বা উল্লেখের স্থান নেই, সুতরাং এ ভাষা আমার নয় এই অভিমান ও দ্রুত বিকাশশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে পারার আশঙ্কাও বাঙালী মুসলমানকে উপরোল্লিখিত অবাস্তব মনোবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রথম দিকে সাহিত্যযশপ্রার্থী মুসলিম যে ভাবে অগ্রসর হিন্দু সাহিত্যব্রতীর অনুকরণ করতেন তাতে হীনমন্যতা বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

১৩৫১-এর বৈশাখ মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে কবি কায়কোবাদকে যে সংবর্ধনা-পত্র দেওয়া হয় তাতে বলা হয়েছিল :

> কবিবর, যে যুগে আমরা পরানুকরণ করিয়া বাঁচিবার সাধনা করিয়াছিলাম, সে যুগেই তোমার অভ্যুদয়।

উত্তরে কবি বলেছিলেন :

> লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, যে যুগে আমি প্রথম কাব্যচর্চা আরম্ভ করি সেই যুগ মুসলমানের জন্য শুধু অনুকরণের যুগ ছিল।

তা সত্যি ছিল। এবং সে যুগে মুসলিম লেখক হিন্দুর মত সুন্দর বাংলা লিখতে পারেন—এই রকম সুখ্যাতিকে চরম পাওয়া যদি মনে করতেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। তবু দেখতে পাওয়া

যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যত বেশী অগ্রসর হয়েছেন তত বেড়েছে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহ এবং কমেছে অভিমান ও ভীতি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে পরানুকরণের নিন্দা, দাবী উঠেছে মুসলিম লেখকদের ভাষা হবে তাঁদের জীবনসন্নিকটবর্তী,

> বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংস্কারের কথা আমি উপরে বললাম, তার জন্যে মালমসলা বহুকিছু আমাদের গ্রহণ করতে হবে পুঁথি-সাহিত্য থেকে। কারণ বাঙালী মুসলমানের—বাঙালী মুসলমান অর্থে আমি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের কথা বলছি না, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভাবছি—বাঙালী মুসলমানের ভাষার যদি কোন প্রামাণ্য দলিল থেকে থাকে তবে তা এই পুঁথি সাহিত্য।
>
> [সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, 'মোহাম্মদী', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১]

অবশ্যি পুঁথি সাহিত্যের অকারণ বা অযৌক্তিক কোন প্রশংসা করা হয়নি, এর ত্রুটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও মুসলিম লেখকগণ সচেতন ছিলেন,

> আমাদের ছিল শুধু পুঁথি-সাহিত্য—বিবর্তনবাদকে অগ্রাহ্য করে একই ভাবধারাকে সে আবহমানকাল ধরে প্রকাশ করে চলেছে। স্থিরনিশ্চল এ পুঁথির জীবন। শিক্ষিত অভিমানী মন একে গ্রহণ করতে চায় না, একে নিয়ে তৃপ্তিও পায় না, অথচ ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এ পুঁথি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সত্য। পৃথিবীতে জীবনের পথে আমরা এত দূর চলে এসেছি যে পুঁথির ভাবধারা আমাদের পক্ষে আজ মিথ্যে হয়েছে, তা হোক কিন্তু আমাদের নতুন জীবনের সাহিত্যে পুঁথির অজস্র কাব্যগুচ্ছ উপাদান জোগাবে যথেষ্ট।
>
> [সৈয়দ আলী আহ্‌সান, 'আমরা যারা লিখছি' 'মোহাম্মদী', কার্তিক, ১৩৫৩]

আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীর উল্টোপিঠে ছিল বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান ও সাধনাকে নিয়ে গৌরব বোধ করবার মনোভাব। যেমন, ১৩৪৪ সনে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান' বিশেষ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সে বছরের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী এই বক্তৃতাবলী সম্পর্কে লিখেছেন,

> দীনেশ বাবু মুসলমান কবি-রচিত কাব্যসাহিত্যের যে কয়েকটি রত্ন উদ্ধার করিয়া তাহাদের মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী মুসলমানের প্রতিভা ও তাহার প্রাণের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বরং মনে হয় এই মুসলমান সমাজের মধ্যেই খাঁটি বাঙালিয়ানা আরও গভীর ও প্রবলভাবে বাঁচিয়া আছে। মোটের উপর এইরূপ সাহিত্যিক গবেষণা ও ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান আজিকার দিনে বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ইহা একটি বড় কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে আরো বলা হয়েছে,

> মাতৃভাষার প্রতি আমাদের মমতা ক্রমশঃই প্রবলতর হইতেছে। আজ আমরা কিছুতেই স্বীকার করি না যে, সাহিত্যিক রসগ্রাহিতায় আমরা পিছাইয়া আছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে মুসলমান ছাত্রসংখ্যার অনুপাত লক্ষ্য করিলে বিরুদ্ধবাদীরাও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তথাপি বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আমাদিগকে আরও জোরে চালাইতে হইবে—যে পরিমাণে আমরা এদিকে অগ্রসর হইব, সেই পরিমাণে আমাদের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হইবে এবং আমাদের বিশিষ্ট কালচারকেই আমরা আরও গভীরভাবে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব। আশা করি, আমাদের হলে আগামী বৎসরের সাহিত্য-বিভাগের কর্ম যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইবে, তাঁহারা ছাত্রগণের মধ্যে উৎসাহবৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিবেন—সাহিত্যিক বৈঠক ও আলোচনাসভার বন্দোবস্ত করিবেন, আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠের আয়োজন ভালো করিয়া করিবেন।

'সওগাতে'র মতে ১৩৫৩-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগ সাহিত্য সম্মেলনে 'অবিরাম রাজনীতি বকিয়াও আমাদের দেশভাইদের প্রাণে শান্তি আসে নাই ; তাই তাঁরা তার একটি বিশেষ অধিবেশন বসাইয়া বাংলায় গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রধান দুর্গ-রক্ষক, হিন্দু মহাসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রাণারাম অভিভাষণ শ্রবণ করেন।' ডক্টর মুখার্জী নাকি বলেছিলেন যে, 'বিভ্রান্ত বাঙালী মুসলমান' বাংলা ভাষা, কৃষ্টি ও সাহিত্যকে নিজের বলে মনে করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। জবাবে 'সওগাতে'র 'সাময়িকী' এই রকম,

> বাংলার মুসলিম নিজেদের বাঙালী অর্থাৎ বাংলার বাশিন্দা বলিতে চায়না কিম্বা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে না, এ কথা মুখার্জী সাহেব কোথায় শুনিলেন ? বা কিরূপে বুঝিলেন ? আমরা তো এই দেখিতেছি যে, আজ এই প্রদেশের মুসলিমরা বাংলা দেশকে পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর রূপে আপনার করিয়া লইতে চাহিতেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যিকেও তারা প্রথম যুগের মতোই আবার নূতন করিয়া নিজেদের জীবন, মন ও প্রাণের সত্যকার রঙে রাঙাইয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম বিভ্রান্ত হইয়াছে, এটা মিথ্যা কথা। তারা এতোদিন বিঘোরে পড়িয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল ; আজ তারা সবখানে, সব দিকেই নিজেদের উপেক্ষিত, বিস্মৃত সত্তাকে পুনর্বার জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইতেছে। এটা মুখার্জী সাহেবের অসহ্য ঠেকিতে পারে ; কিন্তু সে জন্য তাঁর অসত্য ভাষণের প্রয়োজন কি ? তিনি হয়তো রাজনীতির ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যেও হিন্দুয়ানীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে চান। তা তিনি চাহিতে পারেন ; কিন্তু তিনি জানিয়া রাখিলে ভালো হয় যে, সেদিন আর নাই এবং কখনও আসিবে না।

['সওগাত,' বৈশাখ, ১৩৫৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট।

> পাকিস্তানের, অন্তত: পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই হাস্যজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায়ও রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাঁদের অভিমত।
>
> কী কুৎসিৎ পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দু'শো বছর বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রচার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি।
>
> [ফররুখ আহমদ, 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য', 'সওগাত', আশ্বিন, ১৩৫৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, পরাজয়ী মনোবৃত্তি ইতিমধ্যে অপসৃত হয়েছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাহস এনে দিয়েছে।

১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তখনো নতুন নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়নি, পটুয়াখালি কেন্দ্রে এ. কে. ফজলুল হকের নিকট স্যার নাজিমুদ্দীনের পরাজয় ঘটে। এই উপলক্ষে 'বুলবুল' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি সম্মিলনীতে পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক জনাব মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ (বাহার) হক সাহেবকে সংবর্ধনা জানাতে যেয়ে বলেন,

> 'স্যার নাজিমুদ্দিন পটুয়াখালিবাসীদের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, কেননা তাহাদের অন্তরের কুঞ্চিকা তাঁহার হাতে ছিল না, যে ভাষায় পটুয়াখালির মানুষ কথা কয়, স্বপ্ন দেখে, হাসে, কাঁদে তার সঙ্গে তাঁহার গভীর অপরিচয়। হক সাহেবের আকাশের মত উদার প্রাণ আছে, হয়তো সুউচ্চ

ব্যক্তিত্বও আছে, কিন্তু সকল ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহার বাঙালীত্ব। তিনি সর্বতোভাবে বাঙালী, বাংলা তাঁহার মাতৃভাষা; বাংলার—বাঙালীর চিত্তে তাঁহার সহজ গতি। তাই আজ আমরা বাংলা সাহিত্যের সেবকরূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

['বুলবুল', ফাল্গুন, ১৩৪৩]

মুসলমানদের উদ্যোগে কমরেড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে 'বুলবুল' সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন আবার সেই সঙ্গে বিলাতের নির্বাচনে ও নোবেল পরীক্ষকের পদে হিন্দু বাঙালীকে দেখে গৌরব বোধ করেছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একজন অবাঙালী মুসলিম সদস্যের একটি উক্তির সমালোচনা করে 'বুলবুল' বলেছেন,

আমরা মিঃ......'র এ কথার মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিনি বাঙালী নন এবং বাংলার কৃষক প্রজার স্বার্থ কিরূপ শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত হইতেছে, তার ফলে কৃষ্টি ও কৃষকজীবনে কি রূপ ভীষণ দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা তাঁর জানিবার কথা নয়।

['বুলবুল', চৈত্র, ১৩৪৪]

নানা ঘাতপ্রতিঘাত, ঘটনাপরম্পরা এবং ইতিহাস-ভূগোলের প্রভাবে বাংলা দেশের মুসলিম সমাজে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ গঠিত ও বিবর্তিত হয়েছে সাময়িকপত্রে তার মোটামুটি চিত্র এ ভাবেই ধরা পড়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পরস্পর পরস্পরের প্রায় পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে এবং বেশীরভাগ সময়েই এরা অভিন্ন।

॥ দুই ॥

দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান যে একটি জাতি গড়ে তুলতে পারেনি, বরং একে অপরকে কখনো সন্দেহ কখনো ঘৃণা করেছেন তার একটি কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংখ্যালঘুকে জানবার ব্যাপারে নিদারুণ নিস্পৃহতা ও অনীহা। এ সত্য সাময়িক পত্রিকার লেখকগণ নানাভাবে সপ্রমাণিত করেছেন।

ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তোলার অপারগতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে 'ভারতের এক জাতি গঠন' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছিলেন,

> ইউরোপের যেখানে গিয়াছি, যে কোনও হোটেলে থাকিতে পারিয়াছি, যে কোন রেস্টুরেন্টে যাহা ইচ্ছা খাইতে পারিয়াছি... কাহারও কিছু আপত্তির কারণ নাই। বিদেশে যে সামাজিক সুযোগ বা সুবিধা ভোগ করিয়াছি, আমার মাতৃভূমিতে তাহা দুষ্প্রাপ্য। আমার অপরাধ আমার ধর্ম বা বর্ণ। এই সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবিধান না হইলে, কেবল মুখে মুখে ভাই ভাই বলিলে কি ভ্রাতৃভাব আপনি জাগিয়া উঠিবে? হরিজনদিগের জন্য হিন্দু মহাত্মাগান্ধী প্রাণপণ করিয়াছেন। আল্লাহ্জনদিগের জন্য কি কোনও ভারতীয় উদারাত্মা চেষ্টিত হইবেন না? .... To know is to love. আমরা প্রতিবেশী সম্প্রদায় পরস্পরকে জানিয়াছি কি?
>
> ['বুলবুল', কার্তিক, ১৩৪৪]

একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া যাক,

> আমেরিকার নারী চীন দেশে কয়দিন বাস করিয়া জীবন্ত চৈনিক চরিত্রের মূল মর্ম এবং বাস্তবরূপ স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলে জগতের সম্মুখে ধরলেন, অথচ হাজার বৎসর এক সঙ্গে বাস করেও বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বাংলার রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের অস্তিত্ব জীবনে একদিনের জন্যও উপলব্ধি করলেন না। মুসলমান দিনে কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ে—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব শতকরা কয়জন হিন্দুর কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে? উচ্চশিক্ষিত, বিলাতফেরৎ দেশবিখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিক 'তিনি নেমাজ করতে গেছেন' লিখে মোটেই লজ্জিত হন না। 'মুসলমানদের দস্তরখান খেতে কেমন?'—হিন্দুর মুখে এ প্রশ্ন শুনে হাসি পেলেও এ অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। 'সরু সরু করে পাঁ্যাজ কেটে দুধ দিয়ে এমন পায়েস ঈদের দিনে মকুলেশ্বরদের বাড়ীতে রেধেছিল যে,

তাতে একটুও প্যাঁজের গন্ধ ছিল না।' হিন্দুর মুখে এমনিধারা কথা আজও শুনছি এবং হাজার বৎসর পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণও হয়ত শুনবে। ...হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার-উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনৈতিক কর্মী যখন জ্বালাময়ী বক্তৃতার তুবড়ি ছুটিয়ে ভাবাবেগে হাত-পা ছুঁড়ে বলেন, 'আকবর বাদশাকে হিন্দুরা বলেছিল ''দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'' আর মুসলমানরা সেই আকবর বাদশার নাম করে বলে, 'আল্লাহো আকবর,' অতএব ভাই হিন্দু আর ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মিলনে বাধা কোথায়?'' তখন কানে আঙুল দিয়ে সভা ত্যাগ করে চলে আসি বটে, কিন্তু হিন্দু-মনের অজ্ঞতায় শিউরে উঠি। ...মুসলমান হয়ত হিন্দুর ধর্মমতকে অশ্রদ্ধা করে, কিন্তু হিন্দু ব্যক্তিটিকে ঘৃণা করে না, পক্ষান্তরে হিন্দু হয়ত মুসলমান ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু মুসলমান ব্যক্তিটিকে ঘৃণা করে।

[কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, হিন্দু সাহিত্যিক কি সাম্প্রদায়িক 'মোহাম্মদী', মাঘ, ১৩৫০]

১৩৪৫-এর 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী'র প্রথম রচনাটি মোহিত-লাল মজুমদারের 'কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়', এছাড়া আছে তাঁর 'ক্রিটিকের প্রতি গ্রন্থকার'। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু বার্ষিকীর সম্পাদকীয়তে দুঃখ করা হয়েছে এই বলে যে, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পাটনা অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ দেয়ার সময় উল্লেখযোগ্য লেখকদের যে তালিকা 'শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার' উপস্থিত করেছেন 'একজন মুসলমানের নামও' সেখানে পাওয়া গেল না। বার্ষিকী সম্পাদক এই অভিযোগ সরাসরি মোহিতবাবুকে জানিয়েছিলেন এবং যে উত্তর তিনি পেয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে লিখেছেন, 'অভিভাষণে তিনি এত কিছু লিখতে পারলেন আর দু' একজন মুসলমান সাহিত্যিকের নাম করতে ভুলে গেলেন এ কেমন কথা।'

মুসলিম সমাজকে বুঝবার বা জানবার ব্যাপারে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের অনাগ্রহের একটা সুন্দর নজীর আছে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তিতে। নিখিল ব্রহ্ম প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন থেকে তিনি বলেছিলেন যে, মুসলমান তাঁর 'রক্তসম্পর্কে ভ্রাতৃস্থানীয় একই জাতি' অথচ ঐ বক্তৃতাতেই তার একটু আগেই তিনি স্বীকার করেছেন,

> বাঙালী মুসলমান সমাজের কথা আমি ভাল রকম জানি না।
> ['বুলবুল' চৈত্র, ১৩৪৩]

'রক্তসম্পর্কে ভ্রাতৃস্থানীয়' বলার পরও এই যে অহেতুক অজ্ঞতার কথা সুনীতিবাবু অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন সন্দেহ নেই যে সেটাই পাশাপাশি বসবাসকারী দু'টি সম্প্রদায়কে এক হয়ে যেতে দেয়নি। সে অনীহাই এই বিয়োগান্ত নাটকের দুষ্ট চরিত্র। সুনীতিবাবুর অভিভাষণে আরো ছিল,

> ইতিমধ্যে কতকগুলি মুসলমান সাহিত্যিক এই নূতন ভাবের উপযোগী করিয়া বাংলা ভাষাকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস ব্যাপক হইলে বাংলা ভাষায় হয়তো একটি নূতন মূর্তি দেখা দিবে; এবং তদ্দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক সার্বজনীন ভাষা ও সাহিত্য না থাকিয়া, দুইটি সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিখণ্ডিত হইবে।
> [ঐ]

এই উক্তির তাৎপর্যটি অনুধাবনযোগ্য। বাংলা ভাষায় মুসলিম জীবন ভাবধারা তথা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রবেশাধিকার লাভ করুক—এটা কিছুতেই অভিপ্রেত নয়, তাহলেই ভাষা ও সাহিত্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। এই মনোভাবের পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল যে অসহিষ্ণুতা তা-ই শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশকে বিভক্ত করেছে এবং সে ঘটনা ঘটেছে সুনীতিবাবুর অভিভাষণের পরে দশ বৎসরের মধ্যে। অসহিষ্ণুতার মূল কারণ হল এই সত্য যে,

> বাঙালী হিন্দুর চিত্তে একটি অভিমান দুর্জয় হয়ে আছে। সেই অভিমান বলে: আমরাই বাঙালী জাতি, আমাদের ভাবনা, ধর্ম, আচার, কৃষ্টি বাঙালী জাতির নিজস্ব ও সর্বস্ব।
> [মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'হিন্দু-মুসলমান', 'বুলবুল', চৈত্র, ১৩৪৩]

অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্বে অন্তর্লগ্ন হতে হবে। কথাটা ভূদেবচন্দ্রের একটি লেখায় অনবগুণ্ঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'শিখা' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক,

> ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আঁকিয়াছেন। এই জটিল সমস্যার তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক না হইলেও খুবই উপদেশব্যঞ্জক। তাঁহার মতে, 'জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা'।
>
> ['স্বাধীন ভারতের দাস,' 'শিখা', ১৩৩৮]

বাংলার মুসলমান স্বভাবতঃই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেছে। এমনকি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে উত্তেজিত বাঙালিয়ানাকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছিল, তখনও দেখা গেছে সেই আন্দোলনের ধারায় এসে শিবাজী-উৎসবের মত অন্ধগোঁড়ামি সংগোপনে মিলিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও শিবাজীর 'একধর্ম রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' শুনে উৎসাহিত হয়েছেন এবং সে উৎসাহে নবীন সেনের 'এক ধর্ম, এক জাতি—এক রাজ্য এক নীতি'র প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এমন অভিযোগ অযথার্থ নয়।

> বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেন তা নিছক হিন্দুরাই মাত্র......পালন করিতে পারে। বাংলার তদানীন্তন নেতা মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'India in the making' নামক সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে আমরা সেই শোক-দিবসের কর্মতালিকাটি উদ্ধৃত করিলাম :—
>
> (ক) রাখী-বন্ধন উৎসব—প্রত্যেকের বাহুতেই লাল ফিতা বাঁধিতে হইবে। ইহা ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। ইহা প্রাচীন ভারতীয় (মানে হিন্দু) প্রথার পুনঃপ্রবর্তন।

> (খ) ১৯শে অক্টোবরে উপবাসব্রত পালন করিতে হইবে।... খুব সকালে সকলকে খালি পায়ে হাঁটিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে—ইত্যাদি।
>
> উপরোক্ত কর্মতালিকা অনুসরণের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হইল। এবং মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করায় হিন্দুদের উপরোক্ত অনুভূতি উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিল। ফলে, পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা শুরু হইয়া গেল। তাতে বহু মুসলমান ও হিন্দু প্রাণ হারাইল।
>
> শুধু এই মুসলিম-বিরোধী কর্মতালিকাই নয়—উগ্র মুসলিম বিদ্বেষমূলক একটি সঙ্গীতকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া চালু করা হইল। উহাই বঙ্কিম-চন্দ্রের সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত।
>
> [আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'লীগ রাজনীতির ক্রমবিকাশ', মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫১]

এই 'বন্দেমাতরম'কে নিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা ও নিখিলেশের আত্মকথায় এ বিষয়ে অতি উৎসাহের সমালোচনা আছে। বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ এই অসহিষ্ণু মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন, যেমন,

> হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী মিঃ এন. এন. সরকার (এখন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ) এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক যে সঙ্গীতটি আজ-কাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলা যাইতে পারে না। প্রথম যুক্তি এই যে, সঙ্গীতটির জন্ম মুসলিম বিদ্বেষ হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' অন্যতম প্রধান 'সন্তান' ভবানন্দের মুখ দিয়া উহা গাওয়াইয়াছিলেন। এই সন্তানদের ব্রত ছিল 'নেড়ে মাতাল'দিগকে এদেশ হইতে 'মেরে তাড়ানো'। সুতরাং এই

সঙ্গীতে মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ আছে। মিঃ সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূর্ণ। সুতরাং যে বাংলা দেশে শতকরা পঞ্চাশজন অধিবাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে ইহাকে চালান যাইতে পারে না।

['কলস্রোতা', বুলবুল, ফাল্গুন, ১৩৪৩]

বলাবাহুল্য এই সমালোচনা অন্ধ উৎসাহের কঠিন ব্যূহকে ভেদ করতে পারেনি। ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মুসলিম মানসেও,

এইরূপ একটা পুস্তক বাজেয়াপ্ত না করার মধ্যে কি রহস্য ছিল তা বুঝিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবু মরিয়া জাহান্নামী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিত্য নূতন ফল ফলাইতেছে। আজ যে হিন্দু মহাসভা মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে ও মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া শাসাইতেছেন, সংকীর্ণমনা বঙ্কিমবাবুই তাহাদের দীক্ষাগুরু। তাঁহার কৃপাতেই আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্যস্থলে যে সুবিশাল প্রাচীর অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ভেদ করা সুকঠিন। সুতরাং স্বরাজ লাভের আশাও দুরাশা মাত্র।

[সৈয়দ শামসুল ইসলাম, 'আনন্দমঠ', 'আল ইসলাহ্', ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৪০]

স্বরাজ অবশ্যি পরে অর্জিত হয়েছে কিন্তু সে 'স্বরাজ' নয় যার স্বপ্ন অবিবেচক হিন্দুকল্পনায় ধরা পড়েছিল, যার কথা ১৯৩১-এর ২৩শে এপ্রিল বসুমতী সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন বলে 'আল ইস্‌লাহ' উল্লেখ করেছেন,

'যদি স্বরাজ অর্জিত হয়, তবে যে হিন্দু স্বরাজই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?'

এটা বোধ হয় ইতিহাসের নির্মম ব্যঙ্গ ও নিষ্ঠুর প্রতিশোধ যে, যে বাঙালী হিন্দু একদা বঙ্গভাষা রোধ করবার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে পর্যন্ত মানতে স্বীকৃত হননি সেই হিন্দুই বিয়াল্লিশ বছর পরে বাংলা দেশকে সর্বাত্মকভাবে দ্বিখণ্ডিত

করতে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, 'বন্দেমাতরমে'র ধ্বনি তখন তার মনে কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এ প্রসঙ্গে 'সওগাতের' মন্তব্য,

> আজ আমরা শুধু বিস্ময় ও কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, হিন্দু-সমাজের স্বার্থে বাংলা প্রদেশটিকে দ্বিখণ্ডিত করিতেও বাঙালী হিন্দুভ্রাতাদের আপত্তি নাই, অথচ বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বাঙালী হিন্দুরাই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের ব্যবস্থিত বংগভংগ রদ করিবার জন্য কী ভীষণ আন্দোলনই না চালাইয়াছিলেন।...তাঁরা বলিতে লাগিলেন, বাংলা এক ও অবিভাজ্য, তাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙালী হইতে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার বৃটিশের নাই।... আজ দেখা যাইতেছে, সেটা বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনের কথা ছিল না। তখন বাংলায় যে ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল, তাতে হিন্দুরাই আধিপত্য করিতেন, মুসলিমরা পড়িয়াছিলেন উপেক্ষার আস্তাকুড়ে। পূর্ব বংগ ও আসাম প্রদেশে হিন্দুরা এইরূপ প্রাধান্য পান নাই, পাইয়াছিলেন মুসলিমরা। তাই অখণ্ড বাংলার জন্য বাঙালী হিন্দুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আজ আর সে-ব্যবস্থা নাই। বাংলায় আজ মুসলিমরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সংখ্যার দিক দিয়া তাঁদের এই গুরুত্ব আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেও প্রতিফলিত হইতে পারিয়াছে। সুতরাং বাংলার অখণ্ডত্বের মধ্যে বাঙালী মুসলিমকে আজ যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে হটাইবার উপায় নাই, তখন অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র প্রদেশ হইতে কাটিয়া আলাদা করা হোক। কেননা, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সেখানে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাঁহাদেরই আধিপত্য হইবে। বাংলার অখণ্ড সত্তা রক্ষার জন্য বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মাথাব্যথা হওয়া-না-হওয়ার মূল রহস্য যদি এটাই হয়, তা হইলে ভৌগোলিক, সামরিক প্রভৃতি নানাবিষয়ক যুক্তি দিয়া আজ যে তাঁরা অখণ্ড ভারতের প্রতি দরদ দেখাইতেছেন, সেগুলির অসারত্ব সহজেই লোকচক্ষে ধরা পড়িবে। আমরা আশাকরি, তাঁরা অতঃপর অখণ্ড ভারতীয়

> জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তান-বিরোধী ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগের প্রস্তাব সমর্থনপূর্বক ভারত-মাতাকে (?) শান্তি দিবেন।

['সওগাত', পৌষ, ১৩৫৩]

॥ চারি ॥

১৯০৬ সালে যখন মুসলিম লীগের জন্ম হয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধটা তখন জাগ্রত ছিল না, কিন্তু পথ জানা ছিল না আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা পাকিস্তানের পরিকল্পনা আসে অনেক পরে, নানা অবস্থা ঘাতপ্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। মুসলমানরা প্রথমে চেয়েছিলেন স্বতন্ত্র নির্বাচন। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচনই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার উত্তম পথ এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পরে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে এই বোধও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনও নয়, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভারতীয় মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠের অনীহা ও অসহিষ্ণুতা, যাহা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই বোধের বিকাশে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছে।

স্পষ্ট পথের দিশা যখন জানা ছিল না তখনো মুসলিম লেখকদের হৃদয় স্বীয় সমাজের দুর্দশা দেখে বেদনায় আপ্লুত হয়ে উঠেছে। 'শিখা যাঁদের মুখপত্র ছিল সমাজের সকল অংশের সমর্থন বা সহানুভূতি তাঁরা পাননি, উৎসাহের অতিরেকে তাঁরা সমাজকে কখনো কখনো আঘাতও করেছেন হয়ত, তবু 'শিখার' অন্যতম প্রধান কর্মী আবুল হুসেন লিখেছিলেন,

> একদিন আমার কোন বন্ধু বলেছিলেন 'মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি।' তার উত্তরে বলেছিলুম, 'ঠিক ঐ জন্যই আমি মুসলমান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করি না।' মুসলমানের ইতিহাসে আমি গর্ব অনুভব করি না। আমি তার বর্তমান দুর্গতির জন্য গৌরব অনুভব করি, তার কারণ এই দুঃস্থ

> সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নানা প্রকারে সেবা করবার প্রচুর সুযোগলাভ করতে পারব।
>
> ['শিখা', চৈত্র, ১৩৩৩]

সেবার এই মনোভাব সব সময়েই ছিল। 'শিখার' ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা : আব্দুল ওদুদ', 'বাঙলার লোকসঙ্গীত : আব্দুল কাদের', 'বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : রকীবউদ্দীন আহমদ', 'বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক গলদ : আনোয়ারুল কাদির', 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান : মোতাহার হোসেন', 'শিক্ষাসমস্যা : মোমতাজউদ্দীন আহমদ', 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত : আব্দুর রশীদ', 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ : আব্দুস সালাম খাঁ', 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা : আবুল হুসেন', 'মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : আনোয়ার হোসেন।' এই তালিকা থেকে ধারণা করা কষ্ট হয় না 'শিখার' লেখকদের সংবেদনশীলতা কোন্ পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। রকীবউদ্দীন আহমদ তাঁর প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,

> বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া মুসলিমের যদি সুদের ব্যবসায় করিতে হয় তাহাও শ্রেয় তথাপি সর্বহারা হইয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনে 'আল-ইসলাহ্' মুসলমান যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে। পানের বা মিঠাইয়ের দোকান খোলায় মুসলমান এগিয়ে আসবে না কেন? এই জিজ্ঞাসার পরিপূরক হিসাবে ভিন্ন রকম ক্ষোভের প্রকাশও আছে,

> আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই......আমাদের এই জাতীয় জীবনের সকরাতের যুগেও, মুসলিম তরুণ কবি, সাহিত্যিক ঔপন্যাসিকেরা কওমের ভবিষ্যৎ চিন্তা দূর করিয়া—'দূরের নেশা', 'ভুলের বাঁধন', 'কাঁটা ফুল', 'ব্যথার দান' প্রভৃতি লিখিয়া মিনা ও জেরিনার প্রেম ও বিভৎস মনস্তত্ত্ববাদ প্রচারে এতই মশগুল হইয়া পড়িয়াছেন

> যে, কওমের মৃত্যু চিৎকার তাঁহাদের বধির কর্ণে গিয়া পৌঁছিতে পারিল না।
>
> [দেওয়ান মোহাম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী, 'তরুণ সাহিত্যের আদর্শ', 'আলইসলাহ্‌', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯]

এই ধরনের রচনা আলোচ্য সময়ের প্রায় সকল সাময়িক পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে। জাগরণ ও সচেতনতার যে লক্ষণ ও কলরোল এতে দেখা ও শোনা গেছে কালে তা এমন একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল যার ফলে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেননা ভারতীয় মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দ্বিতীয় কোন পথ পরাধীন ভারতে উন্মুক্ত ছিল না। বিদেশী শাসকরা তো বটেই, স্বদেশী প্রতিবেশীরাও সকল পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।

> জাগরণ ও সচেতনতার লক্ষণ এবং সেই সঙ্গে অন্যতম কারণ হিসাবেই অবশ্যি এ ধরনের রচনার প্রধানতম স্বার্থকতা। এদের সাহিত্যমূল্য নিরূপণের কথা যদি ওঠে তাহলে সেটা অন্য ধরনের বিচার। কেননা স্পষ্টতঃই সকল রচনার সাহিত্য মূল্য সমান ছিল না। লেখকের শিল্পদক্ষতার ভেতরও তারতম্য অনিবার্যভাবেই ছিল। এবং প্রয়োজন ও বর্তমানের তাগিদটা এত বেশী প্রত্যক্ষভাবে এসে লেগেছে যে, অনেক সময় অবকাশ মেলেনি প্রকাশ ভঙ্গির পরিচর্যা করার কি তার শিল্প-সুষমা গড়ে তোলার। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে সাহিত্য বিচারের নিরপেক্ষ নিরিখ প্রয়োগ করার যৌক্তিকতাও নেই। লেখকরা যেমন জানতেন আমরাও তেমনি জানি, এ ক্ষেত্রে বক্তব্যটাই বড়, তার অঙ্গাবরণ নয়।

—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা

'পাকিস্তানের' ভূমিকা বিপ্লবী। ভারতবাসীর মুক্তির এটা একটা ঐতিহাসিক স্তর।

কিন্তু কথাটা বোঝবার পক্ষে মস্তবড় বাধা রয়েছে। সে বাধা হচ্ছে এই যে, এর সৃষ্টির পরিবেশ ও বিকাশের ভঙ্গি দেশের মধ্যে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। দেশের চিন্তক ও কর্মীদের অনেকেই বুঝেছেন: 'পাকিস্তান' ভারতবাসীকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বাঁটোয়ারা করতে চাইছে। আসলে কিন্তু 'পাকিস্তানে'র মূল কথা শুধু ধর্মীয় ভিত্তি নয়। ধর্মের সাথে সাথে কৃষ্টি, ভাষা ও সভ্যতার কথাও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো রয়েছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্যও পাকিস্তান অস্বীকার করছে না।

তবু পাকিস্তানীরা হিন্দু-মুসলিমের দুই 'জাতি'ত্বের কথা বলাতেই এই ভুল বোঝাবুঝির কারণ ঘটেছে। বস্তুতঃ ভারতের অনেক অন্যথা-বিপ্লবী ভাবুককেও এই দিক্‌টাই বেশী বিভ্রান্ত করেছে।

তবু 'জাতি'ত্বের কথায় বিপ্লবীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়া ঠিক হয়নি। কারণ কোনো মতবাদের বা আদর্শের গোড়ার কথা বা তার পক্ষে দেওয়া সাময়িক যুক্তিটাই বড়কথা নয়। তার বিষয়বস্তু ও সম্ভাব্য পরিণামটাই বড়কথা। দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজিরের অভাব নেই। ডায়লেক্‌টিকের হেগেলী ব্যাখ্যাই মানুন, আর মার্কসী ব্যাখ্যাই মানুন, এটা দুই ক্ষেত্রেই সত্য যে, ঘাত-প্রতিঘাতেই ভাবধারার বিকাশ হচ্ছে; তর্কে-তর্কেই আমরা সত্য লাভ করছি; নিতান্ত ব্যক্তিগত সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে আমরা বৃহৎ আদর্শের মুখোমুখি গিয়ে পড়ছি। বিরোধ থেকে বিতর্ক, বিতর্ক থেকে সংঘাত, সংঘাত থেকে নতুন সত্য লাভ, এটাই তো প্রকৃতিতে সত্যলাভের চিরন্তন নিয়ম্।

এটা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই যে, ভদ্রলোক হিন্দু ও ভদ্রলোক মুসলমানের সঙ্কীর্ণ শাসনিক স্বার্থের টক্কর লেগেছিল বলেই আজ 'পাকিস্তানে'র কথা উঠেছে। কিন্তু তাতেই 'পাকিস্তান'ও সঙ্কীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে না। কারণ ভদ্রলোকদের সে স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে ছিল। ডান্‌জিগের অধিকার নিয়ে বর্তমান বিশ্ব-যুদ্ধ লেগেছে বলেই এই যুদ্ধের বিপ্লবী ভূমিকা ত' আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

সুতরাং কি নিয়ে কোন্ কথা উঠ্‌লো, আর কি নিয়ে কোন্ সংঘাত বাধলো, এটা বড়কথা নয়। বড়কথা এই যে, সে সংঘাতটা সত্য কি না? সে সংঘাত বর্তমান পরিবেশকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে কিনা? সে সংঘাতের ফলে আমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাচ্ছি কি-না?

এই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে আমরা দেখতে পাই, 'পাকিস্তান' আজ ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও কৃষ্টিক জীবনে এক বিপুল বিপ্লবের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছে। সেটা কী করে হচ্ছে, দু'চার কথায় আমি আজ তাই বুঝোবার চেষ্টা করবো।

চিন্তার দিক থেকে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব চিরন্তন। কিন্তু এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ীরূপ সমাজবাদ। সমাজবাদের মূল কথা সকলকে আত্মবিকাশের সত্যিকার সুযোগ দান। সে সুযোগ দেওয়ার একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা ধন-সাম্য।

তবেই দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেওয়ানী আজাদীর নামে সাম্যবাদের নিন্দা করা হয়, সেই আজাদীই সাম্যবাদের চরম লক্ষ্য। তা হলে যা কিছু মানুষের আত্মবিকাশের স্থায়ী প্রতিবন্ধক, অথবা, সে প্রতিবন্ধকের আয়োজন, তাই প্রগতি-বিরোধী ; আর যা কিছু এই আত্মবিকাশের সহায়ক, অথবা তার আয়োজন, তাই প্রগতিশীল।

এই আত্মবিকাশের আকৃতিটা একরূপী বা ইউনিফর্ম? না, বহুরূপী বা মালটিফর্ম? ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধ এইখানে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও সর্বশক্তিধারী ডিক্টেটরের বিরোধও এইখানে। খোদা ইচ্ছে করলেই দুনিয়াকে একরূপী করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। তার বদলে পয়দা করেছেন তিনি বিচিত্র দুনিয়া, আর বহুরূপী আদমজাতি। দুনিয়ার ডিক্টেটর চান সে বৈচিত্র্য ভেঙ্গে দুনিয়াকে একরূপী করতে। মজা এই যে, ডিক্টেটরের সে একরূপ তার নিজের পছন্দেরই রূপ—আর কারো নয়। কাজেই সে একরূপিত্বের সাম্যটা শুধু বাইরের খোলস, আসলে সেটা দাসত্ব। আমি যখন চাই, দুনিয়ার সব মানুষ আমার মত হোক্, তখন সত্যি সত্যি কিন্তু আমি এটা চাইনে-যে ওরা সবাই আমার

সমান হোক। 'আমার মতো' হওয়া আর 'আমার সমান' হওয়ার মধ্যে রয়েছে আস্‌মান-জমিন তফাৎ। সুতরাং ডিক্টেটরের মতলব সাম্য প্রতিষ্ঠা নয়—শ্রেফ নকল-নবিসীর প্রতিষ্ঠা। আরো সোজা কথায়, গোলামির প্রতিষ্ঠা। অতএব, একরূপিত্বের প্রতিষ্ঠার জবরদস্তী খোদায়ী আইনের—সুতরাং গণতন্ত্রেরও বিরোধী। গণতন্ত্র খোদার সৃষ্টি কৌশলের অনুকরণে বৈচিত্র্যকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে, পুরা সুযোগ দিতে চায়।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই সে আদম জাতির ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে চায়। ডিক্টেটরী ও গণতন্ত্রে, সাম্রাজ্যবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধ এইখানেই।

এই বিরোধ শুধু দুনিয়ার রাষ্ট্রিক চেহারাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মানুষের আধ্যাত্মিক মনেও তার ছাপ পড়েছে। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই, ডিক্টেটর ও সাম্রাজ্যবাদী শুধু মানুষের জায়গা-জমি দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি; তার মনের ভিটে-বাড়ীও উচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী তার দখল-করা দেশসমূহে নিজের শিল্প-দ্রব্যই শুধু পণ্যরূপে চালায়নি; 'সভ্যতার' জাহাজে করে অনেক নতুন নতুন ভাব পণ্যও প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার নামে সে চড়াদামে বিক্রয় করেছে। ফলে, শুধু ধনতন্ত্রেরই একটা আভিজাত্য গড়ে উঠেনি; ভাবতন্ত্রেরও একটা আভিজাত্য গড়ে উঠেছে। এতে করে, শুধু এক দেশের শিল্প, আর এক দেশের শিল্পই ধ্বংস করেনি, এক দেশের তমদ্দুন আরেক দেশের তমদ্দুনও ধ্বংস করেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রসার যত হয়েছে, খোদার সৃষ্টির বৈচিত্র্য তত নষ্ট হয়েছে; মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত সঙ্কুচিত হয়েছে; তার আত্মবিকাশের পথও তত রুদ্ধ হয়েছে। এতে যে একরূপিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আগেই বলেছি, সেটা বাইরের চেহারা মাত্র—অন্তরের নয়। সাদা ইউরোপ যে কালা এশিয়াকে কোট-প্যান্ট পরিয়েছে, ইংরাজী শিখিয়েছে, খ্রীস্টান করেছে, তা কালাকে সাদার দরবারোপযোগী আরদালী ও তার টেবিলোপযোগী 'বয়-বেয়ারা' করবার জন্যই।

'শিক্ষা' ও 'সভ্যতা'র এই যে সাম্রাজ্যবাদ, শাসন ও ব্যাপারীগিরির এই যে বিজয়-অভিযান, এর অর্ধেক করা হয় তলোওয়ারের জোরে; বাকী অর্ধেক করা হয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে। খ্রীস্টান ইউরোপ বিশ্ব জোড়া রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তলোওয়ারের জোরে; আর দুনিয়া-শুদ্ধ

আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে প্রচারের জোরে। তারা বলেছে, দুনিয়ার সব মানুষ যীশুখ্রীস্টের ছেলে; খ্রীস্টধর্মের চোখে সাদায়-কালোয় ভেদ নেই। সব সাম্রাজ্যবাদীই এমনি কিছু একটা শ্লোগানের মুখোশ পরে মতলব হাসিল করে। জাপান গোটা এশিয়াবাসীর উন্নতি সাধনের জন্য ক্ষেপে উঠেছে; ফ্যাসীবাদীরা ইঙ্গ-মার্কিন ধনিকতন্ত্র থেকে ইউরোপকে আজাদ করবার কাজে লেগে গিয়েছে।

এই পটের উপর আমাদের ভারতবর্ষের একটা ছবি তুলুন; দেখ্‌বেন হুবহু মিলে গিয়েছে। এখানেও বিচিত্র ভাব, ভাষা, কৃষ্টি আত্মবিকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই সঙ্গে একটা বিশাল সাম্রাজ্যবাদী মুখও সবাইকে গ্রাস করবার জন্য হা করে করে হাই তুল্‌ছে। বর্ণে, চেহারায়, খাদ্যে, পোশাকে, ধর্মে, ভাষায় সম্পূর্ণ গরমিল চল্লিশ কোটি আদম-সন্তানকে 'একজাত' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে; তাদেরকে রাজধানী থেকে শাসন করবার দাবী করা হচ্ছে। এক জায়গায় সম্পদ দিয়ে আরেক জায়গায় ইমারত গড়াকে, এক জাতির টাকা দিয়ে আরেক জাতিকে চাকরি দেওয়াকে, এক জাতির মাতৃভাষাকে অপর জাতির রাষ্ট্রভাষা রূপে চালিয়ে দেওয়ার জবরদস্তিকে, *'জাতীয়তা'* ও *'দেশ-প্রেম'* বলা হচ্ছে।

ফলতঃ যে ছুতায় ও যে কৌশলে ইউরোপের কয়েক গোষ্ঠী বড়লোক সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব করছে, বোম্বাই কলিকাতা প্রভৃতি কয়টা শহরের কয়েকজন ভদ্রলোক অবিকল সেই ছুতা ও সেই কৌশলেই চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর আত্মিক ও রাষ্ট্রিক পকেটমারার বন্দোবস্ত করেছে।

ইউরোপের ঐ কয়টা গোষ্ঠীর কারসাজি ভেঙ্গে দিয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া। দেশ ও জাতির গণ্ডি ভেঙ্গে মার্ক্সবাদী লেনিন ও স্ট্যালিন 'দেশ-প্রেম' ও 'জাতীয়তা'কে অচল করে দিয়েছেন। অর্ধেক এশিয়া ও অর্ধেক ইউরোপ নিয়ে কমরেড স্ট্যালিন এক বিপুল রাষ্ট্র-সমবায় গড়ে তুলেছেন। অথচ সে সমবায়ের সকলেরই আত্মবিকাশের সমান অধিকার রয়েছে।

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও কৃষ্টি-সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে সকল মানুষকে আত্মবিকাশের সমান অধিকার দিতে পারে একমাত্র সমাজবাদ। এটা সম্ভব রুশীয় আদর্শে রাষ্ট্ররূপ গঠনের দ্বারা।

ভারতের বিপ্লবীরাও এক যুগ ধরে এই স্বপ্নই দেখে আস্‌ছিল। কিন্তু তাদের চেয়ে প্রবল আর একশক্তি অন্যরূপ স্বপ্ন দেখছিল এবং

সে স্বপ্ন সফল করবার আয়োজনও যথেষ্ট হয়েছিল। মনিবের অতুল ঐশ্বর্য দেখে যেমন করে গোলামের মনে অপরের মনিব হবার সাধ হয়, তেমনি ভারতীয় অনেক নেতার মনেই একটা সাম্রাজ্যবাদী খেয়াল জাগে। সাম্রজ্যবাদী শোষণে রক্তহীন ভারতবাসীর মনে একটা সাধারণ ইংরাজ-বিদ্বেষ জেগেছে। বিলাতী বয়কটের দেশপ্রেমিক কর্মপন্থার সুযোগ নিয়ে দেশী কলওয়ালারা যেমন দ্বিগুণ লাভে কাপড় বেচে থাকে, তেমনি এই ইংরাজ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে এ দেশী সাম্রাজ্যবাদীরা একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিল।

অপরের কথা বলবো না ; ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙক্ষার প্রতীক কংগ্রেসের কথাই বলছি। কংগ্রেস আজ ভারতের চল্লিশ কোটি লোককে একজাতি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র ইংরাজ-বিদ্বেষই যদি 'জাতি'ত্বের মাপকাঠি হয় তবে গোটা ভারতবাসী নিশ্চয় একজাতি। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রবল বাসনায় 'জাতি'ত্বের খুঁটিনাটির দিকে ভারতবাসী এতকাল মন ফেরাতে পারেনি। তবু ১৯২৫ সালে মরহুম ডাঃ আন্‌সারীর নেতৃত্বে সমস্ত কংগ্রেসী মুসলমান অবশিষ্ট-ক্ষমতাসহ প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফার কথা তুল্‌লাম না। খোদ কংগ্রেসী মুসলমানদের দাবীর কথাই বল্‌লাম। এ-দাবীর প্রতিও কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা কান দেননি। ১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্ট ভারতের জন্য এককেন্দ্রিক গবর্নমেন্টের সুপারিশ করেন। আলী ভাই-এর মত কংগ্রেস নেতারাও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস স্বমতে অটল থাকেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়েছে। অথচ কংগ্রেস উহা ধ্বংস করার সংকল্প করেন। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তানের' দাবী করেন। জবাবে এলাহাবাদের কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারতের' অবিভাজ্যতার কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বর্ণ-হিন্দুরাষ্ট্র-নেতারা মনে মনে 'অখণ্ড ভারতে'র পরিকল্পনাটা নীরবতার ছাই-এ চেপে রাখছিলেন। মুসলমান নেতাদের 'পাকিস্তানের' তুফানে সে চাপার ছাই উড়ে গিয়েছে। তাঁরা আজ খোলাখুলিভাবেই বল্‌ছেন 'অখণ্ড ভারত' তাদের ধর্মের অঙ্গ। বস্তুতঃ এই 'অখণ্ড ভারত' ব্যাপারটা কী? প্যান-আমেরিকা, প্রেস-বৃটেনিকা,

'গ্রেটার জার্মানীর' কথা আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন। 'অখণ্ড ভারত'ও তাই। আজ যাঁরা 'অখণ্ড ভারত' বল্‌ছেন কাল 'বৃহত্তর ভারত' বলবার জন্য তাঁরা তৈরী হয়েই আছেন। পূর্বে বার্মা, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, পশ্চিমে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান; উত্তরে নেপাল, ভূটান ও তিব্বত এবং দক্ষিণে সিংহল, আন্দামান ও নিকোবরকে 'বৃহত্তর ভারতে'র প্রাকৃতিক অঙ্গ বলতে এঁরা কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। যারা এই 'প্রাকৃতিক' স্বাভাবিকতার প্রতিবাদ করে ঐসব দেশের স্বাধীনতা দাবী করবে, এঁদের মতে তারা হবে 'অবিভাজ্য মহাভারতের' 'মহান ভারতীয় জাতীয়তার' মহাশত্রু। 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ-উন্নতির' কারবারে যোগ দেয়নি বলে চীন জাপানের হাতে যেরূপ মার খাচ্ছে; 'গ্রেটার রাইখের' 'প্রাকৃতিক' বন্দোবস্তের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পোলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর হাতে যেমন ঘুষি খাচ্ছে, 'বৃহত্তর ভারতের' বিরুদ্ধতা যারা করবে তাদেরও তেমনি মার-ঘুষি খাবার জন্য তৈরী থাক্‌তে হবে।

এই খানেই পাকিস্তানের বামপন্থী বিপ্লবী ভূমিকা। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে বহু বামপন্থী সাম্যবাদী ছিলেন ও আছেন। তাঁরা কেউ অখণ্ড ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাননি বা পারেননি। একমাত্র পাকিস্তানই সে সাম্রাজ্যবাদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে।

এ-কাজটা বামপন্থীদের বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছনীয় ধরনে হয়েছে, এ-কথা আমি বলতে পারছি না। শুধু তাই নয়। বিপ্লবী কারণে ও বামপন্থী উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দাবী উঠেছে, তাও বলতে পারছি না। কিন্তু তাতেই 'পাকিস্তানের' পরিবেশ ও সম্ভাব্য পরিণাম নষ্ট হয়ে যায়নি। সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি নিয়ে ইংরাজ-জার্মানীতে লড়াই বেধেছে। কিন্তু আততায়ী ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ধনিক-গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়েই বামপন্থীর ভূমিকা করতে হচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধের কারণ ও ইংরাজের মনোভাব দিয়ে যেমন আমরা বর্তমান যুদ্ধকে বিচার করতে পারি না, তেমনি 'অখণ্ড ভারত' ও 'পাকিস্তানের' সংগ্রামকে আমরা আজিকার লীগ-নেতৃত্বের মতলব দিয়ে বিচার করতে পারি না। আমরা জানি, ইউরোপ মহাদেশ থেকে ইংরাজের মুরুব্বিয়ানা ষোল আনা দূর করতে জার্মানী যদি না

চাইত, যদি ইংলণ্ড-জার্মানীতে শক্তি-বাঁটোয়ারার একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হতে পারত, তবে ইংরাজ হঠাৎ অতটা গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মুরুব্বি হয়ে উঠতো না। তেমনি আমরা এটাও জানি, লীগ-নেতাদের সঙ্গে শক্তি-বাঁটোয়ারায় কংগ্রেস নেতৃত্বে যদি রাজী হতেন তবে লীগ নেতৃত্ব ভারতের উৎপীড়িত জনগণের স্বার্থ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য হঠাৎ এমন হাহাকার করে উঠতেন না। কিন্তু জনগণের সৌভাগ্যবশতঃ এবং ঐতিহাসিক কারণে যেমন ইংরাজ-জার্মানীতে আপোষ হয়নি, তেমনি ঐতিহাসিক কারণেই কংগ্রেস ও লীগের সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতা বাঁটোয়ারা করতে রাজী হয়নি। ইংরাজ-জার্মানীর মত দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঠোক্করে যেমন করে বর্তমান বিপ্লবী যুদ্ধ বেঁধেছে; তেমনি, কংগ্রেস-লীগ দুইটি ভদ্রলোক-প্রতিষ্ঠানের ঠোক্করে 'অখণ্ড ভারত' ও সাম্যবাদী ভারতের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছায় লড়াই করতে হচ্ছে, বঞ্চিত লীগ নেতৃত্বকেও হয়তো তেমনি নিতান্ত অনিচ্ছায়ই ভারতের জনগণের পক্ষে লড়াই করতে হচ্ছে। দূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদী চেম্বারলেন যেমন করে আপোষের দ্বারা যুদ্ধ রুখ্‌তে চেয়েছিলেন, ভারতীয় ভদ্রলোকদের দূরদর্শী প্রতিনিধি রাজা-গোপালও তেমনি আপোষের দ্বারা 'পাকিস্তান' রুখ্‌তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে উভয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই বেধে গিয়েছে।

যুদ্ধ রুখ্‌বার উপায় নেই। বিশ্ব-বিপ্লবের আর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর অভিপ্সিত মতে এ যুদ্ধের উপসংহার আর হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদ চুরমার হয়ে গিয়েছে। ঠিক তেমনি, ভারতীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে লড়াই বেধেছে। 'অখণ্ড ভারত' চূরমার হয়ে গিয়েছে। লীগ নেতারা ইচ্ছা করলেও এখন আর নিজেদের ইচ্ছামত ভারতকে জোড়াতালি দিতে পারবেন না। যে কারণে এবং যেরূপে তাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন সে কারণে এবং সেরূপে আর 'পাকিস্তান' আস্‌ছে না। 'হিন্দুস্থান' ও পাকিস্তানরূপে ভারতবর্ষ আর দুইটা 'জাতীয়' দেশে বিভক্ত হচ্ছে না। এ-সংগ্রামের পরিণামে ভারতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারী-ভোগী স্বাধীন সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে পরিণত হতে বাধ্য। এটাই পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা।

আরেকটা কথা বললেই আমার বক্তব্য শেষ হবে। 'পাকিস্তান' কথাটাই অনেককে বিচলিত করেছে। বিপ্লবী ভাইদের কাছে আমার আরজ, শুধু নাম দেখে ভয় পাবেন না।

'কম্যুনিজম' অর্থাৎ সম্প্রদায়বাদ হল বড় ভাল জিনিস; আর 'কম্যুন্যালিজম' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদ হয়ে গেল, যাচ্ছে-তাই। আবার দেখুন, 'কম্যুন্যালিজম' যদি বা খারাপ হল, কিন্তু 'ন্যাশনালিজম' থেকে গেল অতি উচ্চাঙ্গের জিনিস। 'ব্যাকরণ' বা 'অভিধান' এ 'আর্থিক' বিপ্লব রুখতে পারলে না।

তবে বিপ্লবীরা 'পাকিস্তানের' আভিধানিক অর্থ নিয়ে মাথা খারাপ করবেন কেন? তাঁরা 'পাকিস্তানের' বিচার করবেন আসন্ন ও পরিকল্পিত ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতুড়ী হিসেবে। এই হিসেবে 'পাকিস্তান' শুধু ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের 'সাম্প্রদায়িক' দাবী নয়—এটা গোটা ধার্মিক, কৃষ্টিক ও ভৌগোলিক মাইনরিটি সমবায়ের ত্রিশ কোটি ভারতীয়ের 'জাতীয়' দাবী। 'পাকিস্তান' ভারতের এই সব মূক জনসাধারণের প্রাণে আত্মবিকাশের আশা জাগিয়েছে; যুগ-যুগান্তের অবহেলা-উপেক্ষায় মুমূর্ষু বহু ভারতীয় মানব-গোষ্ঠীর মনে আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ করেছে; ঘৃণিত, উৎপীড়িত অগণিত আদম-সন্তানের বুকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহস দিয়েছে; শতাব্দীর নিষ্পেষণে আত্মহারা ক্ষীণকণ্ঠ বহু 'জাতির' মুখে আজাদীর ভাষা ফুটিয়েছে। বিপ্লবীর বিচারে এটাই 'পাকিস্তান'। 'পাকিস্তান' শুধু একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব নয়—এটা একটা ভাব-বিপ্লবও বটে।

এ বিপ্লবের পরিণাম সুন্দর হতেই হবে। হিন্দু কায়েমী 'স্বার্থের বড় তরফ ও মুসলিম বুর্জোয়ার ছোট তরফের ভিতরকার এই সংঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার এই 'অখণ্ড ভারত'কে খণ্ড খণ্ড হতেই হবে। তার ফলে কী হবে? বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর যেমন করে সাম্যবাদী নয়া দুনিয়ার প্রাসাদ গড়ে উঠ্‌বে, তেমনি ভারতীয় 'অখণ্ড' কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস-স্তূপের উপর গড়ে উঠ্‌বে আমাদের চির স্বপ্নের, চির সাধের, চির সাধনার নয়া ভারতের বিচিত্র গুল-বাগিচা। আর সে গুল-বাগিচা মুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌বে রঙ্‌-বেরঙের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্যের ফুলে ও ফলে॥

১৫ই অক্টোবর (১৯৪২) পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সভায় পঠিত।

—আবুল মনসুর আহমদ

মোহাম্মদী:
ফাল্গুন, ১৩৪৯।

মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বাধীনতা

অনেক কংগ্রেস কর্মীর মনে মুসলিম লীগ সম্বন্ধে যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে আছে সে হচ্ছে এই : তাঁরা অনেকেই মনে করেন মুসলিম লীগ ও তার নেতৃত্ব পুরাপুরি সাম্প্রদায়িক। তাঁরা মনে করেন লীগ সাম্প্রদায়িক ও আত্মস্বার্থের কাছে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে কসুর করে না। সেই জন্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকেও তাঁরা যেমন মনে করেন একটা অসম্ভব দাবী বলে তেমনি সন্দেহ করেন হয়তো বৃটিশরাজের পরামর্শেই মুসলিম লীগ আজ ভারতের একতাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য, ভারতের অধীনতাকে ও ইংরেজের শোষণকে ভারতের বুকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য এই দাবী পেশ করেছে।

লীগ ও তার পাকিস্তান দাবী সম্বন্ধে এমনিতর ধারণাকে নিজেদের মনে সৃষ্টি করে কংগ্রেস কর্মী লীগ সম্বন্ধে কোন কথা কানে তুলতেই রাজী হন না। লীগের সাথে কোনপ্রকার সম্পর্ক সাধনই যে সম্ভব নয় এমনি ঘোষণা তারা প্রচার করেন।

সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে লীগের জন্ম হয়। এই সময়ের মধ্যের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটাকে আমরা যদি তার বিভিন্ন স্তর ক্রমে পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবর্ধনের প্রকাশ রূপেই দেখা দিয়েছে আর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রম-অগ্রগতির সাথে সাথেই অগ্রসর হয়েছে মুসলিম সমাজের এই আত্মচেতনা।

১৯০৬ সনে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড মিন্টোর ভারতের শাসন সংস্কার তখন প্রবর্তনের পথে। মুসলিম লীগ তাই এই সময়ে দাবী করেছিল যে, নূতন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানকে স্বতন্ত্র ভোটাধিকার দেওয়া হবে, আইনসভাগুলোতে তাদের জন্য পৃথক আসন রক্ষিত থাকবে। মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র ভোটাধিকার ও পৃথক আসন রক্ষার দাবী সম্বন্ধে অনেক জাতীয়তাবাদী মনে করেন মুসলমানদের

এই স্বতন্ত্র দাবীই ভারতের একতার মূলে কুঠার হেনেছে। তারা মুসলমানদের এই দাবীকে বৃটিশ রাজের চক্রান্ত বলে মনে করেন—ভারতে বৃটিশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে একতা গড়ে উঠছিল সেই ক্রমবর্ধমান একতাকে বাধা দেবার জন্যে বৃটিশের সকল চক্রান্ত।

যে দুটা বস্তুদ্বারা উপরের মতবাদকে সমর্থন করা হয় তার একটি হচ্ছে তখনকার লীগে বৃটিশ রাজতন্ত্রের পক্ষীয় ধারণার অবস্থান। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিভেদ, সে যে কারণেই ঘটুক না কেন সব সময়ে শোষণ-কারীর সহায়তাই করে থাকে। কিন্তু যে বস্তুটাকে অলক্ষ্যে ফেলে যাওয়া হয় সে হচ্ছে এই: হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বৃটিশ রাজের সৃষ্টি নয়। কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণের জন্য হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতে রয়ে গেছে—আর ইংরেজ সেই সমস্যাটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

সুতরাং আমাদের জন্য যেটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সে হচ্ছে, এই সমস্যাকে সমাধান করা—যে সমস্যা ইংরেজ তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে আমরা যেন সেই সমস্যার সমাধান করে বৃটিশ রাজতন্ত্রকে পরাজিত করতে পারি—ঘটনার মোড়কে আমাদের কল্যাণের পানে ঘুরিয়ে দিতে পারি।

স্বতন্ত্র নির্বাচন

আচ্ছা একটা প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯০৭ কি তার পরে মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র নির্বাচন ও পৃথক আসনের দাবী করেছে সে কি অন্যায় হয়েছে? গণতন্ত্রের নীতির কোন হানি কি সে দাবী করেছে? প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে হলে আমাদের যেমন মুসলমানদের সেই সময়কার অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে তেমনি তার সেই অবস্থাকে দেশের তখনকার রাজনৈতিক গতির সাথে তুলনা করে বিচার করতে হবে।

১৮৫৭ সনের ঘটনাবলীও বৃটিশ রাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর দেশের মধ্যে একমাত্র কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজই শিক্ষায়, শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নত স্থান অধিকার করেছিল।

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগুলো তখন বস্তুতঃ শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বপ্রকারে অনুন্নত হয়ে পেছনে পড়ে ছিল। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি অংশের উন্নতির দিকে কোন মনোযোগ দেওয়া তখন হয়নি। আরো বিশেষ করে ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় মুসলমান সমাজ তখন আইন শিক্ষায় কোন সুযোগ নিতে পারেনি। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ্ আহমদ খান হিসাব করে দেখিয়েছিলেন ঐ সন পর্যন্ত, হিন্দু বি-এ পাস যুবকদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৪১৮৭, মুসলমান বি-এ পাস যুবকদের সংখ্যা সেখানে মাত্র ৫৪৬।

এই অবস্থাতে যদি আমরা স্মরণ করি যে তখন ভোট দেওয়ার অধিকার নির্ধারিত হোত শিক্ষা ও সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে। তখন একথা বুঝতে আমাদের দেরী হবে না যে সেই অবস্থাতে যে একমাত্র উপায়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাদের সমাজকে সেবা করতে পারত সে শুধু পৃথক নির্বাচনের অধিকার দ্বারা। এই হচ্ছে পটভূমিকা। এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই স্তরে স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকারই ছিল একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থা যার সাহায্যে আত্মচেতন শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায় তাদের সমাজের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারত। কাজেই স্বতন্ত্র নির্বাচনের এ দাবী ছিল আমাদের দেশের মুসলমান সমাজের আত্মউন্নতি ও আত্মবিকাশের দাবী। এর প্রয়োজন ছিল এরই জন্য যে তারা তখন ছিল অপর সমাজ ও অংশের তুলনায় সর্ববিষয়ে অনেক পেছনে।

স্বায়ত্তশাসনের দাবী

তারপরের লীগের পাঁচ বছরের ইতিহাসের মধ্যেই তার দাবী স্বতন্ত্র নির্বাচন ছাড়িয়ে মুসলমান সমাজের জন্য বৃটিশ রাজত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন অধিকারের দাবীতে. যেয়ে পৌঁছায়। বিভিন্ন দেশে এই সময়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে, যেমন: তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভেংগে দেওয়া, জারের রাশিয়া কর্তৃক পারসিয়া আক্রমণ, মালয়ে মুসলমানদের নির্যাতন, সে সব ঘটনাই ভারতে মুসলমানদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভাবের বন্যা

সৃষ্টি করে তোলে। আবুল কালাম আজাদ তাঁর উর্দু 'আলহিলাল' ও মোহাম্মদ আলী তাঁর ইংরেজী পত্রিকা 'কমরেড'-এর মারফত তখন দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন স্বাধীনতার জন্য উঠে দাঁড়াতে। আলীগড়ের এম. এ-ও কলেজে বিরাট এক রাজনৈতিক আন্দোলনও সংঘটিত হয়। ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে বলকান যুদ্ধের সময়ে তুরস্কে এক মুসলিম মেডিক্যাল মিশনও পাঠান হয়।

কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসন লাভকে আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিল ১৯০৫ সনে। এবার লীগেরও ঐ একই আদর্শ ঘোষণার ফলে দেশের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরস্পরের খুব নিকটবর্তী হয়ে এল। মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী এই পরস্পরের নৈকট্যকে আরও দ্রুততর করে দেয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ পরস্পর আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন। ১৯১৫ সনে একই সময়ে দুই প্রতিষ্ঠানই বোম্বাইতে অধিবেশন আহ্বান করে। লীগের এই অধিবেশনে তখন সভাপতিত্ব করেছিলেন বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী মোজহারুল হক সাহেব। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হয়।

এই আলাপ-আলোচনার ফলস্বরূপ আমরা পাই ১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট; আর এই প্যাক্টেরই ফলে ১৯১৭ সনে যখন মিঃ মন্টেগু ভারতে আসেন তখন কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে একটা একতাবদ্ধ দাবী পেশ করতে পেরেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদিগণ এই একতা দেখে চমকে উঠেছিল—রীতিমত ভয় পেয়েছিল। লর্ড সিডেনহাম একে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন—এমন কি প্রমাণ করতে পর্যন্ত চেয়েছিলেন এ জার্মানীর কারসাজি।

১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট

এবার যদি আমরা ১৯১৬ সনের এই প্যাক্টের বিশেষ বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখি তাহলেও দেখতে পাব যে, এখানেও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে দাবীগুলো জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে, সে পাঞ্জাব ও বাংলার সচেতন মুসলমানের অধিকারসমূহের দাবী, কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের ন্যায্য হাত ও সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের

পূর্ণ রক্ষা। একথাও তখন স্বীকৃত হয়েছিল, মুসলমান ভিন্ন নির্বাচনের অধিকার পাবে—প্রদেশগুলির আইনসভায় তার আসন নির্দিষ্ট থাকবে। পাঞ্জাবে তারা পাবে পূর্ণ সংখ্যা আসনের অর্ধেক—বাংলাতে পাবে শতকরা চল্লিশ ভাগ। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তাদের নির্বাচিত হবে, একথাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে তিন চতুর্থাংশ মুসলিম সভ্যদের আপত্তি উপেক্ষা করে কোন আইন পাস হবে না—ইহাও স্বীকৃত হয়েছিল।

মুসলমানদের এই দাবী, কংগ্রেসের এই সম্মতি যে বিষয়টাকে পরিস্ফুট করে তোলে সে হচ্ছে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানের জাগরণ। পূর্ণ গণতন্ত্র তখনো আসেনি, আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা তখনো সংকীর্ণ—এই অবস্থাতে কংগ্রেসের আজকার এই স্বীকৃতি মুসলমান সমাজের জাগরণের পূর্ণ সহায়তার প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রে $\frac{1}{3}$ অংশ আসনের রক্ষাও এই কথার স্বীকৃতি, যে মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না—ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের সম-অধিকার দাবীর প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে কোন্‌প্রকার ফেডারেশন গঠিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সমস্ত স্বার্থকে অন্যান্য বৃহত্তর ও উন্নততর জাতির কাছ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে সে দাবীর এই-ই প্রথম প্রকাশ।

এক আদর্শের সংগ্রাম

লাখনৌ প্যাক্টের পরবর্তী সময়কে মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক মিঃ নোমান এই বলে লিখেছেন: কয়েক বছরের জন্য লীগ ও কংগ্রেস একই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে জন্মভূমির জন্য একই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে সংগ্রাম চালায় (মুসলিম ইণ্ডিয়া—১৬০ পৃঃ)। ১৯১৬ সনে একতার যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে একতা এর পরে ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলে। ফলে, যুদ্ধ শেষে যখন রাওলাট আইনের প্রবর্তন হয়—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা হয়—অর্থনৈতিক বিপত্তির উদ্ভব হয়, সমগ্র দেশ তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বাইরের ঘটনা যথা রুশ বিপ্লব, প্রাচ্যের

দেশ সমূহের নবজাগরণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুরস্ক সাম্রাজ্য বণ্টন ইত্যাদির প্রভাবও ভারতবাসীর উপর কম পড়েনি। কংগ্রেসের গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু ও মুসলিম লীগের আলী ভাই......দের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের বিরাট স্রোত ভারতকে ভাসিয়ে দেয়। যে তিনটা ধ্বনি এই বিখ্যাত আন্দোলনে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল--সে ছিল স্বরাজ, রাওলাট আইনের প্রত্যাহার এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরবের মুসলমান দেশসমূহের স্বাধীনতা (খেলাফত)। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'স্বরাজ-খেলাফতের' অধ্যায়ের চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় বোধ হয় আর নাই। দেশের দুইটি প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি এসে দাঁড়াল, একই সাথে সভা করল—হিন্দু-মুসলিম নেতা একই মঞ্চে বক্তৃতা করলেন। সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল, কংগ্রেস ও লীগের একতার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন।

এখানটাতেও একটু বিচার করে দেখা যাক কোন অনুপ্রেরণাতে মুসলমান সমাজ সেদিন নেমে এসেছিল আন্দোলনের মাঝে, কোন আদর্শ ও কোন প্রাপ্তির আশা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদেরকে এই সংগ্রামে। স্পষ্টতঃ দুটি কারণ। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ তারাও চেয়েছিল এবং তারই জন্য তারা লড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ মুসলমান জাতি সমূহের স্বাধীনতা, ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা।

স্বরাজ-খেলাফত আন্দোলনের এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুসলিম দেশ শ্রমিক আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। অবশ্য একথা সত্য খেলাফত আন্দোলনের বহিরাবরণ ছিল ধর্মীয়—এক খলীফার অধীনে সমস্ত মুসলমান দেশকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্য তাতে ছিল। কিন্তু ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে যে বস্তুটা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল সে খলীফার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ততটা নয় যতটা তাদের নিজেদের মনের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব। কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গান্ধীজী একথাটা তখন উপলব্ধি করে খেলাফতকে আন্দোলনের একটা অংশ করতে পেরেছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমানের এমন ঐক্য তখন সম্ভব হয়েছিল, যে ঐক্যের দৃঢ় আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত তখন কেঁপে উঠেছিল।

বিরোধ

কিন্তু তবু অসহযোগ বিফল হলো—বিফল হলো এরই জন্য যে জনগণের সামনে নেতৃবৃন্দ তখন কোনপ্রকার স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরতে পারলেন না। স্বরাজের সংজ্ঞা দেওয়া হলো না—স্বরাজের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল। কৃষক মজুরের দাবী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর কোন মূল্য দেওয়া হলো না—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরিহার্য অংশরূপে এদেরকে স্বীকার করে নেওয়া হলো না।

অসহযোগ আন্দোলন বিফল হওয়ার ফল এই হলো যে, দুইটি প্রধান প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এল ভাংগন ও বিরোধ। কংগ্রেসের মধ্যেও এল দ্বিধাবিভক্তি; একদল হলো পরিবর্তন বিরোধী—অপর দল স্বরাজ্যবাদী।

মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রবেশ করল। সাথে সাথে শাসনতন্ত্রকে পুনর্গঠন করার প্রশ্নকে তারা হাতে তুলে নিলেন। মিঃ জিন্নাহ্ ও তাঁর দলও কংগ্রেসের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে সহযোগিতা করলেন। কংগ্রেসও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা মীমাংসা করে একটা দাবী বৃটিশ রাজের কাছে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করল। ১৯২৪ সনের বোম্বাই অধিবেশনে মুসলিম লীগ ও বিভিন্ন দলের সাথে আলাপ-আলোচনা চালনার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করল

এরপর চল্‌ল অধিবেশনের পর অধিবেশন, আলোচনার পর আলোচনা—কিন্তু ঐক্য তখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ১৯২৭ সনে সাইমন কমিশন নিয়োগের সংবাদ এল। সংবাদের সাথে সাথে ভারতব্যাপী বিদ্বেষের বন্যা বইল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই একে বর্জন করল—প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে আবার ঐক্যের আলোচনার চেষ্টা চল্‌ল।

মুসলমানদের দাবী রূপ পেল মিঃ জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফায়। মিঃ জিন্নাহ্ এবারেও তাঁর কার্যপন্থায় সব মুসলিম দলগুলিকেই একত্র করতে সমর্থ হলেন—খেলাফত আন্দোলনের নেতা মৌলানা মোহাম্মদ আলী, জমিয়ত অল-উলামা কনফারেন্স ও লীগ সবাই এসে জড়ো হলো মিঃ

জিন্নাহ্‌র দাবীর পেছনে। যাঁরা এ দাবীতে এলেন না তাঁরা ছিলেন মাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী ডাঃ আনসারী ও মৌলানা আজাদ। কিন্তু তবু তাঁরাও একটা নিষ্পত্তির জন্য রাজী ছিলেন। ফলে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেহরু-বিবৃতির খসড়া রচিত হলো।

এখানে মুসলিম দাবীগুলি বিচার করে দেখা প্রয়োজন কি কি দাবী তাদের ছিল, নেহরু-বিবৃতির সাথে তফাৎটা তাদের কোথায় ছিল—আর কেনই বা ১৯২৮-এ কলকাতায় সর্বদলীয় অধিবেশনে কোন নিষ্পত্তিই সম্ভবপর হলো না এসবগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখার এখানে প্রয়োজন আছে।

নেহরু বিবৃতি

নেহরু রিপোর্ট ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সুপারিশ করে, নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ ব্যতীত অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ভার এই রিপোর্ট অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার ব্যবস্থা হয়। যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই সব প্রদেশেই মাত্র তাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে রাখার ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। কেন্দ্রে কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এ রিপোর্ট অনুসারে ছিল না—কেন্দ্রে মুসলমান মোট আসনের এক চতুর্থাংশ লাভ করবে একথা মাত্র বলা হয়েছিল। নেহরু রিপোর্টের এই ছিল স্বীকৃতি।

অন্যদিকে মুসলমানদের দাবীর বিশিষ্ট বিষয়গুলো ছিল, কেন্দ্রের পরিবর্তে অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ থাকবে প্রদেশসমূহের হাতে। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম অংশকে বিভিন্ন প্রদেশ বলে গণ্য করতে হবে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাকে গরিষ্ঠ রাখতে হবে। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন অন্ততঃপক্ষে যতদিন পর্যন্ত মুসলমান তার বিলোপ দাবী না করে সে পর্যন্ত রাখতে হবে। মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণ রক্ষার ব্যবস্থা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় করতে হবে। কেন্দ্রে মুসলমানদের আসন মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ হতে হবে।

এখানে আমরা আরো স্পষ্টভাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি মুসলমান জাতি তার আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়া কি ভাবে এগিয়ে এসেছে। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানের সমান অধিকার দাবী—বাংলা ও পাঞ্জাবকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেওয়ার দাবী তাদের এই জাতীয় জাগরণের প্রকাশ স্বরূপ এবার পরিষ্কারভাবে দেখা দেয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবী

কাজেই এবার যখন স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার কাঠামো রচনা হতে চললো তখন মুসলমান এগিয়ে এসে এ কাঠামোতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূর্ণ সুযোগের দাবী জানায়। এরই জন্য তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ভাইয়ের কাছে এ প্রশ্ন জানায়—যেন ভারতের স্বাধীনতার অর্থ মুসলমানের জন্য কি হবে একথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়—স্বাধীন ভারতে তাদের বিভিন্ন উপায়ে উন্নতির কি সম্ভাবনা আছে একথা তারা জানতে চায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : কংগ্রেস কি এতদিন ধরে এমনি গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্যই সংগ্রাম করেনি—আজকের মুসলমান সমাজ যে গণতান্ত্রিক দাবী পেশ করছে, গণতান্ত্রিক এ বোধ উদ্বুদ্ধ করাই তো ছিল কংগ্রেসের এতদিনকার দায়িত্ব ও কর্ম। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে এতদিনকার অত্যাচারিত, মূক অন্ধ্র, তামিল, মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের মনে আজ এক অভূতপূর্ব জাতীয়ভাবের উদয় হয়েছে—ঠিক তেমনি মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাও আজ তাদের জাতীয় এই দাবীতে আত্মপ্রকাশ করছে।

কাজেই আজ সম্মুখে অগ্রসর হতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন জাতির এই রাজনৈতিক চেতনাকে স্বীকার ও তার উন্নতির বন্দোবস্ত করা। তবেই মাত্র স্বাধীনতার যুদ্ধে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা হবে সম্ভব—সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা হবে সহজ—স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে পারব আমরা আরো দ্রুত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি প্রয়োজনীয় এ জিনিসটা হলো না—ফলে ঐক্যের চেষ্টা হলো বিফল। আর এই বিফলতার ফল এই হল যে ১৯৩০ ও ৩২

সনে কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে তখন মুসলমান সমাজ এ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেল না।

তারপর রাউণ্ডটেব্‌ল কনফারেন্স ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর আবার চেষ্টা করা হলো ঐক্যের, কিন্তু এবারেও বিফল হলো এ চেষ্টা। এমনিভাবে অনৈক্যের অবস্থা গড়াতে থাকে এবং ১৯৩৭ সন এসে পৌঁছায়।

ইলেকশন ও তারপর

নির্বাচন হলো। কিন্তু কংগ্রেস এই মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচন থেকে যে ফল আশা করেছিল ঘটতে লাগলো তারই বিপরীত। কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ক্রমান্বয়েই দানা বাঁধার বদলে ক্রমান্বয়েই মুসলমান কংগ্রেস হতে সরে দাঁড়াতে লাগল।

মুসলিম লীগের এই সময় আরম্ভ হয় জাগরণ। মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব এভাবে আত্মপ্রকাশ করল মুসলিম লীগের নূতন দাবীতে—সে দাবী রূপ নিল এবারে এই ভাবে: এমন স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত থাকে।

এখানেও আমরা কি দেখিতে পাই? যখনই ভারতের স্বাধীনতার কথা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনি মুসলিম সমাজের দাবী প্রকাশ পেয়েছে তার নিজের স্বাধীনতার রূপে অর্থাৎ তখনি তারা এই দাবী করেছে যে স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা হবে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র'।

কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের আমলে শুধু যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন সমাধানই হলো না এই নয়, বরঞ্চ এই সময়ে সমস্যাটা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে চলতে থাকে যার ফলে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে যখন যুদ্ধ বাধে এবং ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল সকল যখন পদত্যাগ করে তখন লীগ তাকে মুক্তি দিবস বলে ঘোষণা করে ও পালন করে।

যুদ্ধ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে মুখ্য করে তুলল তবু ১৯১৬ সনের মত কংগ্রেস-লীগ মিলতে সমর্থ হলো না। এর পরে কংগ্রেস যখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করল লীগ তখন ১৯৪০-সনে লাহোরে তার

বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশগুলোর স্বাধিকার দাবী করল। ফাসিস্ত জাপান তখন আক্রমণোদ্যত—ভারতের এই দুর্দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস-লীগের মীমাংসা ও ঐক্য। অথচ তা হলো না—এমন কি ক্রিপস্ প্রস্তাবের সময় পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। ফল এই হলো যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর হাতে কোনপ্রকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করেই রেহাই পেল।

এই সময় হতে দেশের অবস্থা ক্রমান্বয়েই খারাপ হতে থাকে—অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে ওঠে, দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেশকে গ্রাস করে ফেলে—আমলাতন্ত্র একটা একটা করে দুর্বিপাকের বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়, ভারতের প্রধান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অনৈক্যের ফলে আমলাতন্ত্রের এই জুলুমবাজী-দেশের এই সঙ্কট।

স্বাধীনতার পথ

প্রশ্ন হচ্ছে: তাহলে পথ কোথায়? কি করে আমাদের দেশের এই দুই প্রতিষ্ঠান এক হয়ে দাঁড়াতে পারে? ওপরে আমি যা বলেছি তাতে এ বস্তুটা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, মুসলমান সমাজ ও মুসলিম লীগের উন্নতি পৃথক নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান দাবী পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি নয়—মুসলমান সমাজের এই উন্নতিকে আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে ভাবলে চলবে না বরঞ্চ এর এই উন্নতির বিভিন্ন স্তরকে মুসলমান সমাজে জাতীয়, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের ক্রমিক প্রকাশ হিসাবে দেখা উচিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যত অগ্রসর হয়েছে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীও তত পরিষ্কার ও বাস্তব রূপ নিয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসাবে ভাবার আমাদের কোন কারণ নাই। ১৯৩২ সনের মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতি বিখ্যাত উর্দু কবি স্যার ইকবালের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। 'স্বাধীন ভারতে মুসলমান তার নিজের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভাব-ধারা দ্বারা তার জীবনকে উন্নত করতে পারবে—এ নীতি যদি স্বীকার

করে নেওয়া হয় তাহলে মুসলমান ভারতের স্বাধীনতার জন্য তার সর্বস্ব পণ করতে রাজী থাকবে।'

এই দৃষ্টিতে দেখলে এটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাব যে, বাইরের দিক থেকে কংগ্রেস-লীগ আজ বহু দূরবর্তী মনে হলেও তারা আজ আদর্শের দিক দিয়ে পরস্পরের অতি নিকটে এসে পৌঁছেছে। উভয়ের আদর্শই আজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা—উভয়ে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাস করে—উভয়েই ভারতের বিভিন্ন জাতির জীবনের মহত্তম ভাবধারার প্রতিনিধি স্বরূপ।

তাহলে এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস যদি পাকিস্তান দাবীকে এই দৃষ্টিতে দেখে, তেমনি মুসলিম লীগ যদি জনগণের অনুকূলে গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে—তার মন্ত্রিসভা ও প্রতিষ্ঠানকে এমনি ধারায় নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য যখন এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য আসা হবে অবশ্যম্ভাবী। এই ঐক্যই আমাদের আদর্শ। আজ ভারতের প্রত্যেকটি স্বদেশ প্রেমিকের জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তি এই আদর্শের জন্য নিয়োজিত করা একমাত্র কর্তব্য।

[ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'পাকিস্তান'—৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ থেকে গৃহীত]

সাজ্জাদ জহির

পাকিস্তান কেন

[ভারতীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবীর সমর্থনে মনীষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে সময় সময় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের নিকট পেশ করিব। এবার মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন বিচার করিয়া দেখুন। অথচ রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুরা জাতীয়তাবাদী বলিয়া থাকেন।—সম্পাদক : পাকিস্তান।]

আমাদের দেশে ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সংগে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে, তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি; আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।

তাহাকে যথার্থ আমাদের সংগী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষংগিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল এতদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোন বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগ বাঁটোয়ারার বেলায় উভয়পক্ষে ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে করিয়াই আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংক বেশী হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কিনা মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে, আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এ রকম মিলিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাব মাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুশী হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সংগে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ সেখানে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পর জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে দেখিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের আপাততঃ যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ।

ততদিন সে আর কাহারো সংগে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ ; বড় হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়ঃ।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান করিয়া লইতে হইবে। সে বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশী দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবীতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত ; পদমান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুর পক্ষেই মংগলকর।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশী ঝোঁক দিতে চাই না। ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলিই প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশংকার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোন কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে এক ঝোকারকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(কবি সম্রাট)

[উপরোক্ত অভিমতটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 'পাকিস্তান' পত্রিকা, ২৬শে জুন, ১৯৪৪ সালে উদ্ধৃত করিয়াছে। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল বাংলা ১৩১৮—সম্পাদক।]

আ লো চ না

উদ্বোধন

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

সে আজ বহুদিনের কথা, সপ্ততি বৎসরের কম নহে, আমি যে-কালে প্রথম বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করি, সে-কালে আমরা চারিজন ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান লেখক ছিলেন না। সেই চারিজনের তিনজন কালের অতল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। মাত্র আমি একা এখন জীবিত থাকিয়া কবরের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে তিনজনের নাম শুনিতে বোধ হয় আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। একজন কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়ার মীর মোশাররফ হোসেন ও অন্যজন পড়ানের পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন, ইঁহারা দুজনেই গদ্য লেখক, মাত্র আমি কবিতা লিখিতাম। ইহার কিছু পরেই শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক আসিয়া আমাদের সংগে মিলিত হন। ইনিও কবিতা লিখিতেন, মাঝে মাঝে গদ্য লেখাও তাঁহার অভ্যাস ছিল।

সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা বলিতেন, 'মুসলমানেরা বাংলা লিখিতে জানে না।' এসব শুনিয়া আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিত, বলিতে কি হিন্দুদের ঐসব শ্লেষ উক্তি আমার হৃদয়ে বিষম বাজিত। সে সময় হিন্দুদের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশী ছিল না। মাত্র 'আর্য্যদর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'বঙ্গবাসী', 'সোমপ্রকাশ' 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাত-আটখানা পত্রিকা ছিল। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের বংগীয় সাহিত্যিক বন্ধু মীর মোশাররফ হোসেন তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন 'জমিদার দর্পণ' ও 'বসন্ত কুমারী' নাটক। ইহা আমাদের পক্ষে কতকটা লজ্জাকর বিষয় বটে, রায় বাহাদুরই হউন, কি বিদ্যাসাগরই হউন, আমরা কেন তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইব? আমরা কি লিখিতে জানি না? খোদাতালা আমাদিগকে যে শক্তি ও প্রতিভাটুকু দিয়াছেন, কেন আমরা তাহার অপব্যবহার করিতে

যাইয়া কলংকের ডালি মাথায় তুলিয়া লইব? ইহার পরও তিনি 'এর উপায় কি?' প্রহসন লিখিয়া হিন্দু লেখকদের দ্বারা নিতান্ত লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলেন। সে সময় 'বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E. বাহাদুর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত লিখিয়াছিলেন, 'এসব আগাছা সাহিত্যের উদ্যান হইতে কাটিয়া ফেলাই উচিত।' আরও লিখিয়াছেন, 'এর উপায় কি?' শুধু মীর সাহেবকে এইরূপ বিদ্রূপ করিলে প্রাণে এত বাজিত না। মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এসব কটূক্তি করাতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, উহারা কোন বহি হাতে লইয়া মুসলমান গ্রন্থকারের নাম দেখিলেই ফেলিয়া দিত।

আমি এই সব অবমাননার বোঝা মাথায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মুসলমান লেখক বাংলা লিখিতে জানে কিনা, তাহা এই হিন্দু ভায়া-দিগকে দেখাইতে হইবে। এই চিন্তা করিয়াই আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়া-ছিলাম। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি শব্দও ছিল না যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু ধুরন্ধরগণ মুসলমানের লেখা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। এমন কি উহা পাঠ করিয়া সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' লিখিয়াছিল, 'মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না।' মহাকবি নবীন সেন লিখিয়াছিলেন, 'মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। আপনার "অশ্রুমালা" তাহার প্রভাত শিশর-মালা স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।' বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র—'সারস্বতপত্র' লিখিয়া-ছিলেন, 'কবি কায়কোবাদ মুসলমান, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা মুসলমানী নহে, কায়কোবাদের বাঙ্গালা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর।'

এই সব লেখা দ্বারাই আপনারা বুঝিতে পারেন, মুসলমানদের লেখার উপরে হিন্দুদের কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। আমি এইজন্যই আমার লেখাতে বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যতীত অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করি নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ সেজন্য বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুদের লেখার অনুকরণ করিয়াছি। বাস্তবিক

তাহা নহে। হিন্দুরাই যে কেবল বিশুদ্ধ বাংগালা লিখিতে পারেন, মুসলমানরা লিখিতে পারেন না, তাহাদের সেই অন্যায় ধারণা ও অযথা গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি। আমি অনেক অনাবশ্যক কথার উল্লেখ করিলাম, কারণ আমার উপরে আধুনিক মুসলিম লেখকদের যে একটি অন্যায় ধারণা ছিল উহা দূরীভূত করিবার জন্যই এই প্রয়াস।

এখন আর সেদিন নাই, আমরা উল্লিখিত চারিজন মুসলমান সাহিত্যিক মুসলিম বংগভাষার সেই শৈশব সময়ে যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া সাহিত্যের উদ্যান সৃজন করিয়াছিলাম, সেই ফুলকুল শোভিত সাহিত্য-উদ্যানে আজ আধুনিক বহু মুসলিম সাহিত্যিক নূতন নূতন সুগন্ধি ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা দেখিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। এখন আর আমাদের সেই বংগভাষা দীনহীনা দরিদ্রা নহে। দুনিয়ার মধ্যে যত ভাষা আছে, তাহাদের সকলের সম্মুখে আমাদের এই বংগভাষা রতনে বসনে ও নানাবিধ অলংকারে বিভূষিতা রানীর মত দাঁড়াইতে সক্ষম।

আজ আপনাদের অনুকরণের কোন প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বংগভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন, কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। আজ আপনাদের পথ উন্মুক্ত। আজ আপনাদের সাহিত্য-উদ্যানে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, মওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ এমদাদ আলী, নজরুল ইস্‌লাম, জসীম উদ্দীন, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন আপনাদের চিন্তা কি? আজ আপনারা 'পূর্ব-পাকিস্তান সংসদে'র যে কোন সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন, করুণাময় খোদাতালা আপনাদের সহায় হইবেন।

আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, আপনারা মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করিয়া এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। দরিদ্র মুসলমান লেখক-লেখিকাদিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করা—এ সংগে মুসলমানদিগকে সৎপথে টানিয়া আনা ও বহুবিধ সৎকার্য সম্পাদন করা আপনাদের এই সংসদের উদ্দেশ্য। এজন্য আপনাদের একটি স্থায়ী তহবিল করাও উচিত।

এজন্য আমি অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি ও আশীর্বাদ করিতেছি। খোদাতালা আপনাদের ঈপ্সিত সমস্ত সৎকার্যে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, ইহাই তাঁহার পবিত্র চরণে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমিন।

[মোহাম্মদী : ফাল্গুন, ১৩৪৯] —কায়কোবাদ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পত্র

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পত্র]

সামান্য কয়েকটি কথা মাত্র আমি আপনাদের গোচরীভূত করিব। বেশী বলার ক্ষমতা বর্তমানে আমার নাই। চিরদিন আমি তরুণের পক্ষপাতী। কারণ জাতির জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করার অধিকার ও শক্তি একমাত্র তরুণেরই আছে; বেপরোয়া হইয়া এমন সেবা আর কেহ করিতে পারে না। আর এই শক্তি সঞ্চারের মূল উৎস হইল সাহিত্য। যে-জাতির সাহিত্যে প্রচুর জীবনীশক্তি আছে এবং তাহা দিনদিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। মোটেই ক্ষয়িষ্ণু নয়, ইচ্ছা করিলেই সে জাতিকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিয়া আপনারা সাহিত্যের পথে অগ্রসর হইবেন। আপনাদের মধ্যে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আসিয়াছে দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়াছি। আপনারা যাহা সৃষ্টি করিবেন তাহা যেন জাতির কাজে লাগে, সে-সাহিত্য যে পর্যন্ত মুসলিম জনসমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্য না হইবে সে-পর্যন্ত মনে করিবেন, যে-সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে নবপ্রেরণা আনিতে পারিবে, আপনারা তাহা হইতে দূরে আছেন। হতাশ হইবার কিছুই নাই, আপনাদের আরও উদগ্র বাসনা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আপনারা মনে রাখিবেন, আমাদের সমাজ শিক্ষার দিক দিয়া ততদূর অগ্রসর হয় নাই, যতদূর অগ্রসর হইলে আপনাদের চিন্তাধারার সহিত তাহাদের পরিচয় হইতে পারে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেমন আপনারা বলিষ্ঠ ভাবধারা দেশময় ছড়াইবেন, তেমনি করিয়া দেশে শিক্ষার যাহাতে দ্রুত বিস্তার হয় তাহার চেষ্টাও আপনাদেরই করিতে হইবে।

কোন জাতির নবজীবন লাভ সহজে হয় না, উহার জন্য বিপুল সাধনার দরকার, সে সাধনা আপনাদের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠুক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। নানা দেশের জাতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে, ভাবের বিপ্লব না ঘটাইয়া কেহ সাহিত্যের ভিতর দিয়া নবজীবন আনিতে পারে নাই। সর্বপ্রথমে ভাবের বিপ্লব ঘটাইবার

জন্যই আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু নিজদের তালিম ও তমদ্দুনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনাদের কাজ করিতে হইবে। কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ সর্বদা আপনারা সম্মুখে রাখিবেন। মনে রাখিবেন আপনারা মুসলমান। ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যতদিন মুসলমান জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় রত ছিল ততদিন কেহ তাহাদের অবনমিত করিতে পারে নাই, এবং সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাহাদের মনীষীরা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণ করিয়া একদিন খ্রীস্টান ইউরোপ পাইয়াছিল নবজীবন, কেবল সাহিত্যে নয়, সর্বদিকে। গ্রীক ও রোম্যান সংস্কৃতি যখন লুপ্তপ্রায়, প্রকৃত জ্ঞানার্থীর মন লইয়া সেই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আরব জাতি যে মহা সাধনা আরম্ভ করেন তাহা হইতেই হয় ইসলামী সংস্কৃতির জন্ম, নূতন সভ্যতার প্রচার। এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরব জাতির মধ্যে নূতন করিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, ইহারই নাম Arab movement—আরব আন্দোলন। আন্দোলন চলিয়াছে সাহিত্যের ভিতর দিয়া। দিন দিন ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে; আরবজাতি বাঁচিতে চায়, মরিতে তাহারা রাজী নয়। আমরাও বাঁচিতে চাই, মরিতে আমরা চাই না। কিন্তু আমাদের বাঁচাইবে কে? বাঁচাইবে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ। তাঁহাদের কর্তব্য ও আদর্শ যদি তাঁহারা একপ্রকার ঠিক করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তাহাই জাতির সেবায় তাঁহাদের উৎকৃষ্ট দান হইবে।

আল্লামা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফ্‌গানী বলিতেন, মুসলমানদের পৃথিবীময় এক-শাসনের অধীন হইতে হইবে—ব্যক্তিবিশেষের শাসনাধীন নয়, কোরআনের শাসনাধীন। ইসলামজগৎকে যিনি নবজীবনের পথে আনিয়াছেন ইহা তাঁহারই বাণী, আর কাহারও নয়। এই মহাবাণী তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। Arab movement-এরও মূল মন্ত্র এই Back to the Quran, এই আন্দোলনের জন্মদাতাই তিনি। মুসলমান বাঁচিতে চাহিলে সারা মুসলিম জাহানকে এই এক আদর্শেরই অনুসারী হইতে হইবে।

আমাদের মধ্যে কোন্‌ কবি বা সাহিত্যিক বড় ইহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই, অনাগত যুগের মুসলিম বাংলা তার বিচার করিবে।

আমরা শুধু দেখিব, জাতির ভিতরে নবচেতনা আনিতে কে কতটুকু দিয়াছেন, কার ভাণ্ডারে আমাদের জন্য কতটুকু সঞ্চয় হইয়াছে; যিনি যত বেশী দিবেন, তিনিই আমাদেই মনের সিংহাসনে স্থান পাইবেন।

তরুণদের রচনার মধ্যে আমি প্রাণের স্পন্দন পাইতেছি বলিয়াই তাহাদের রচনা আমার ভাল লাগে, তাঁহারা আদর্শ ও লক্ষ্যপথ যদি একবার স্থির করিয়া লইতে পারেন, আর তাঁহাদের রচনা যদি প্রাণবন্ত হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নবজীবন আসিতে বাধ্য, তাহাকে আসিতেই হইবে। তাঁহারা আজ দুরূহপথের যাত্রী, এ-যাত্রা তাঁদের সফল হোক, জয়মণ্ডিত হোক!

মুসলিম বাংলা-সাহিত্যেরও একটা ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিবার সময় এখন নয়। কিন্তু তার বর্তমান যাঁরা ,গাড়িয়াছিলেন তাঁরা একটা লক্ষ্যপথ সম্মুখে রাখিয়াই ও-কাজ করিয়াছিলেন। তাঁদের শ্রম ব্যর্থ হয় নাই, আপনারা তাঁদেরই উত্তরাধিকারী। আপনাদের মাপকাঠিতে তাঁহাদের দান যদি অল্প মনে হয়, এ-কথা স্মরণ রাখিবেন জাগরণী মন্ত্রের প্রথম সাধক তাঁরা। নিঃস্ব কয়েকজন সাধক—সম্বল ছিল তাঁদের কেবল প্রাণের ঐশ্বর্য, আর কিছু নয়। ইহাই একমাত্র তাঁদের লভ্য হয় নাই, কিন্তু আপনাদের হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁরা পথ কাটিয়া দিয়াছেন আপনাদের সুগম যাত্রার জন্য, সেই পথ দিয়া আপনাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হোক—যে-সিদ্ধিলাভ প্রত্যেক সাধনার লক্ষ্য আপনাদের সে-সিদ্ধিলাভ হোক্।

[মোহাম্মদী: ফাল্গুন, ১৩৪৯] সৈয়দ এমদাদ আলী

সমিতির সভাপতির আহ্বান

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা যে-সংসদের উদ্দেশ্য, তার নাম দেশজ হওয়াই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি। যে-সমিতি বংগ দেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে নবগতি প্রদান করবার আশায় সৃজিত হলো তাকে ইংগ-বংগ নামে অভিষিক্ত করে এর প্রকৃত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবার বাসনা আমাদের নেই।

অনেকে 'পূর্ব' শব্দটিতে আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেন যে এই শব্দটির দ্বারা পাকিস্তানের অর্থ ক্ষুদ্র একটি ভৌগোলিক পরিবেশে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং আমাদের সংসদের কর্মক্ষেত্রকেও সংকুচিত করা হয়। তাঁদের প্রতিবাদ এক হিসাবে ভুল নয়, কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত বলেই মনে করি। আমাদের এই নাম ভারতের অন্য কোথায়ও এইরূপ উদ্দেশ্য ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট কোন সাহিত্য-সংসদের সংগে এই সমিতির মিলনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না বলেই আমাদের ধারণা। আমরা যে ভাষায় সমিতির কার্যনির্বাহ করব তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই 'পূর্ব' শব্দ যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন বাংলাভাষা হবে এ-প্রশ্ন বহুপূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। এতদিন পরে উর্দূ-বাংলা-প্রশ্নের উত্থাপন করা পণ্ডশ্রম ও হাস্যকর বলেই বিবেচিত হবে। ভারতের সার্বজনীন ভাষা হিসাবে উর্দূর দাবী অগ্রাহ্য করা নিষ্প্রয়োজন এবং সেই কারণে উর্দূ শিক্ষার প্রসারও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু উর্দূকে বংগদেশীয় মুসলমানের সাহিত্যের বাহন করে তোলবার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে উর্দূ বিদেশী-ভাষার সমতুল। এর ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমি সম্বন্ধে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই এবং এর ব্যাকরণ আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। উর্দূর স্থান ভারতে যাই হোক, এই ভাষায় উন্নত শ্রেণীর

সাহিত্য স্বষ্টি বাঙালী মুসলমানের পক্ষে সম্ভব, সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁর কোন জ্ঞান আছে তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করবেন না।

সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসংগে জনৈক ফরাসী সমালোচক একস্থানে বলেছেন :

> Superior literary creation has remained so far bound up with the complex psychological organization which a national mind represents, and chiefly with that perfect, intimately possessed instrument of expression, a mother tongue.'

বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, উর্দু নয়।

উর্দু-বাংলার সমস্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি করেছি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই, কারণ এ-ধরনের আলোচনা আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটা অহেতুক অনিশ্চয়তার পরিচয় প্রদান করে। উর্দুবাদীরা—যাঁরা প্রায় সকলেই উর্দুভাষী, অতি অল্পই একথা উপলব্ধি করেন যে, বাংলা ভাষার সাথে আমাদের সংযোগ ইতিহাসগত। বাংলা ভাষার বিকাশ এবং ক্রমোন্নতির পথে বাঙালী মুসলমানের সহায়তা দ্বারাই আমাদের সংগে এ-ভাষার নৈকট্য ও একাত্মতা দৃঢ়ীভূত হয়েছে। এ সহায়তা শুধু মাত্র এদেশের মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। অধিকন্তু মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-স্বষ্টি দ্বারা এ-ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আলাওল ও অন্যান্য সাহিত্যিক ব্যতীত এই সাহিত্য রচনা পুথি সাহিত্য নামীয় প্রচলিত বিরাট জন-সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য এ-পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়নি এবং এ-বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচকদের মতামতও আমার অজ্ঞাত। কিন্তু শিক্ষিত-সমাজের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের এরূপ বিস্তার ও বিকাশ একটা পরম্পরাগত বিরাট ঐতিহ্যের স্বরূপকেই পরিস্ফুট করে। উন্নত সাহিত্য স্বষ্টিতেই এইরূপ ঐতিহ্যের পরিণতি সাধারণত: ঘটে, এবং এ-কথা স্থির সত্য যে রাজনৈতিক কারণে এই ধারা বাধাপ্রাপ্ত না হলে মুসলমান লেখকদের পক্ষেও হয়তো উনিশ শতকের হিন্দু সাহিত্যের সমতুল উন্নত সাহিত্য স্বষ্টি করা সম্ভব হত। কিন্তু মুসলমানদের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে এই ঐতিহ্য শিক্ষিত-সমাজ অন্তর্প্রবিষ্ট হতে পারলো না এবং তার গতি ব্যাহত হয়ে গেল।

সাহিত্যিক উন্নতির পশ্চাতে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা সেই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যই হারিয়ে বস্‌ল। রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটা নিস্পৃহতার সৃষ্টি করে সমস্ত সমাজদেহকে আড়ষ্ট করে তুলল।

কেউ বল্‌তে পারেন যে, 'পরাজয়ের গ্লানি হিন্দুসমাজকেও স্পর্শ করেছিল; কিন্তু সেটা তাদের সাহিত্য বিকাশের অন্তরায় হয়ে উঠেনি।' কিন্তু এই প্রতিবাদ দ্বারা ইতিহাস জ্ঞানের স্বল্পতাই প্রমাণিত হয়। বৈদেশিক শাসনের অসুবিধা হিন্দুরা ভোগ করেছে কি-না তা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি যে হিন্দুসমাজকে স্পর্শ করেনি তা নিঃসন্দেহ। কারণ বিজেতা ইংরাজ শাসককে তৎকালীন হিন্দু সমাজ মুক্তিদাতা বলেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এটা কেবল শাসক-পরিবর্তন সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজের মধ্যবর্তিতায় ভবিষ্যতে হিন্দুস্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্ভব—হিন্দুসমাজ এ বিশ্বাস পোষণ করত। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য সমসাময়িক হিন্দুসাহিত্যিকের রচনাতে এই আশা ও মুক্তির আশ্বাসবাণীই পরিস্ফুট।

আমি বলেছি যে, মুসলমানদের সাহিত্যিক বিকাশের গতি রাজনৈতিক পরিবর্তনে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের পূর্বে যে কেন এ-সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি সে একটা আশ্চর্যের বিষয়। ইতিহাসজ্ঞেরা এ সম্পর্কে কি বলেন আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণা, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিশ্বাসের অভাবই এর প্রধান কারণ। আলাওল প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন সত্য কিন্তু যে শিক্ষিত সমাজের উপর ভাষার উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে তারা এ-ভাষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেননি। সাময়িকভাবে বাংলা মুসলমান শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেত; মুসলমান সাধারণের চেষ্টায় বিরাট জনসাহিত্যের উদ্ভবও হয়। কিন্তু সভ্য সমাজের উপর কোন প্রভাব বিস্তারের পূর্বে রাজনৈতিক দুর্যোগে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশৃংখলা এসে উপস্থিত হয়।

তবে দূরদর্শী মুসলমানেরা যে অনেক পূর্বেই বাংলা ভাষার সাথে বাংগালী মুসলমানের সংযোগের যথার্থ মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আলাওল সাহিত্য। সপ্তদশ শতকের একজন মুসলমানের বাংলায় সাহিত্য-স্বষ্টির এই প্রয়াসের মূল্য অত্যন্ত বেশী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলাওলের স্থান ঠিক কোথায় তা নির্ণয় করা একদিক দিয়ে দুরূহ। ঐতিহাসিক বিচারে, বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের সূচনা আলাওল থেকেই হওয়া উচিত। কিন্তু আলাওলের সাহিত্যে মুসলিম সমাজের প্রতিচ্ছবি নেই। তিনি একান্তভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। তাই সহধর্মী হলেও তিনি আমাদের সগোত্র নন। তাঁর স্থান আমাদের থেকে একটু দূরে। তাঁর সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব করা সাজে, কিন্তু তাঁর নিকট হতে অনুপ্রেরণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। আমাদের প্রয়োজন যে জাতীয় সাহিত্যের, যার উদ্ভব আমাদের সামাজিক জীবন থেকে, আলাওল সেইরূপ কোন সাহিত্য আমাদের প্রদান করেননি। তিনি সম্মানার্হ, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করা চলে না।

তবু সমাজ-জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলেই আলাওলের সাহিত্যকে প্রাণহীন ও নিষ্প্রভ বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে সজ্ঞানে যে আদর্শের অনুসরণ করেননি সেই আদর্শের আলোকেই তাঁকে বিচার করা হলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। আলাওলের পশ্চাতে একটা সুনির্দিষ্ট মুসলিম ঐতিহ্যের অভাবই তাঁর সাহিত্যের প্রাণহীনতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আলাওলের সাহিত্য স্বষ্টির পশ্চাতে যে ঐতিহ্যের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি সে বাংলা ভাষার সাধারণ এবং সার্বজনীন ঐতিহ্য। এই ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে আলাওলের সাহিত্য প্রাণহীন বা নিষ্প্রভ বলে মনে হয় না। কিন্তু সমাজ চেতনা তাঁর রচনায় নেই এবং সেইদিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের সংগে সংস্রববর্জিত।

এর কারণ এই যে, আলাওল তাঁর যুগে কোন সমাজকে কেন্দ্র করে সাহিত্য স্বষ্টির প্রয়োজন বোধ করেননি, যেমন করেছি আমরা। হিন্দু-মুসলিম সমস্যাও তখন এমন সুপ্রকটভাবে ধরা দেয়নি। আলাওলের পরবর্তী যুগে কোন উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক নেই। এ-যুগের সাহিত্যও মুসলিম সামাজিক জীবনের সংগে সংযুক্ত নয়। পূর্বেই বলেছি যে, পরাজয়ের গ্লানি মুসলমান সামাজিক জীবনের আবহাওয়াকে

এমনিভাবে বিষাক্ত করে তোলে যে তখন সাহিত্য-সৃষ্টি এক অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না এবং মুসলিম সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের এই ইতিহাসকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে মুসলিম সমাজ জীবনকে কোন স্থান দেননি বলে আর্তনাদ বা বিক্ষোভ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সাহিত্যে মুসলিম সমাজ জীবনকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব শুধু মুসলমান সাহিত্যিকের পক্ষেই। উনিশ শতকের সাহিত্যিক জাগরণে মুসলমানের স্থান নেই, সেই জন্য দায়ী হিন্দুসমাজকে করা চলবে না। অপরিচিত সামাজ-জীবন সম্পর্কে সাহিত্যরচনা কোনকালেই সম্ভব নয়। হিন্দু সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক দৈন্যই অনাবৃত করে তুলি।

হিন্দু সাহিত্যিক যে মুসলিম সমাজ-জীবন অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেননি তার কারণ আমাদের সংগে তাঁদের সমাজের রয়েছে একটা গভীর অপরিচয়ের ব্যবধান। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁরা এই অপরিচয়কে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যেই পাই এর স্বীকৃতি। সেটা সজ্ঞান স্বীকৃতি কি-না সে-সম্বন্ধে সংশয় থাক্‌তে পারতো, কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত, সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা।

হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বৈপরীত্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার অবকাশ এখানে নেই। রাজনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য হিন্দুরা এ-কথা যতই অস্বীকার করুন, তাঁদের সামাজিক নিষ্ঠা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত করেছেন তাঁরা প্রত্যহই। এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক আন্দোলনের সূচনা। বিংশশতকের প্রারম্ভে সাহিত্যানুরাগী মুসলমানেরা এ-সত্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করেও একে তাঁদের সাহিত্যে রূপায়িত করতে পারেননি। তাঁরা করতে চেয়েছিলেন হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুকরণ। ফলতঃ তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস আছে, কিন্তু নেই কোন সহজস্ফূর্ত প্রাণশক্তি। আমরা আজ নিশ্চিতরূপে বুঝেছি যে স্বীয় সমাজকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সৃষ্টিই মুসলমানের পক্ষে জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলবার একমাত্র পন্থা।

এর ভিতরই 'সাহিত্যে পাকিস্তান সম্ভব নয়' বলে একজন হিন্দু ঔপন্যাসিক আপত্তি তুলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যে বিভেদকে প্রশ্রয় দেয়া শুধু অন্যায়ই নয়, সাহিত্য-প্রকৃতি বিরুদ্ধও বটে। সাহিত্যে

পাকিস্তানের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। কিন্তু এ-কথাকে অস্বীকার আমরা কিছুতেই করতে পারছিনে যে বাংগালী মুসলমানের মত বিশিষ্ট সমাজের একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য দাবী করবার অধিকার আছে। সাহিত্যে আপনার চিত্র প্রতিবিম্বিত করে দেখবার আগ্রহ এবং আকুতি থাকা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ আগ্রহ অন্যায়ও নয় এবং অসম্ভবও নয়। বরঞ্চ এটা না থাকাই তার মানসিক ক্লৈব্যের পরিচয়। অন্যান্য সাহিত্যেও এপ্রকারের আন্দোলনের সাক্ষাৎ মেলে। Celtic Revival-এর কথা নিশ্চয়ই উল্লিখিত ঔপন্যাসিকের অজ্ঞাত নয়। যেহেতু Celtic Revival-এর সংগে আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক আন্দোলনের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়ে গেছে, এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়ত অবান্তর হবে না।

পশ্চাদ্‌ভূমির দিক দিয়েও আমাদের সংগে Celtic Revival-এর অনেক মিল দেখতে পাই। Celtic Revival-এর পশ্চাতে ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আমাদের আন্দোলনের পশ্চাতে আছে হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করবার একটা প্রয়াস। উভয় আন্দোলনই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। আবার দেখ্‌তে পাই, উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের সংগে সাম্রাজ্যবাদের ভাষা-গত একটা সংযোগ রয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যের বাহন তার সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ভাষা ইংরেজী; বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের বাহন বাংলা—যে-ভাষা এ-যাবৎ হিন্দুদের সাধনাতেই পরিপুষ্ট হয়ে আস্‌ছে। Celtic Revival-এর পূর্বে Swift, Goldsmith, Sheridan, Thomas Moore, Bernard Shaw প্রভৃতি আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু সে সাহিত্যের সংগে আয়ার্ল্যাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নেই। আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ভাষা ইংরেজী হলেও ইংরেজী সাহিত্য আয়া-র্ল্যাণ্ডবাসীর নিকট ছিল বিদেশী সাহিত্যের সমতুল। জীবনের সংগে যে সাহিত্যের সংযোগ নেই তাকে কোন সমাজ জাতীয় সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না, এবং পারাও সম্ভব নয়। বাংলা দেশের মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আজ, আইরিশ সাহিত্যিকদের সমস্যাও ছিল ঠিক তাই।

Yeats, যিনি ছিলেন Celtic Revival-এর পুরোধা, এক স্থানে বলেছেন, 'a national drama or literature must spring from a native interest

in life and its problems and a strong capacity for life among the people.' আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধেও Yeats-এর এ উক্তির পুনরাবৃত্তি করা চলে। বাংগালী মুসলমানের ভিতর Yeats, Synge বা O' Casey-র মত কবি বা নাট্যকারের আবির্ভাব অদ্যাপি হয়নি ; তবে আমরাও উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের সাহিত্যের উপজীব্য হবে আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন। যাঁরা বলছেন সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ নেই, Celtic Revival-এর সাফল্যই তাঁদের ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। Swift অথবা Shaw বিদ্যমান থাকতেও যদি Yeats এবং Synge-এর প্রয়োজন হতে পারে, তবে বাংগালী মুসলমানেরা স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে না কেন ?

সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভেদ টেনে আনা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। Celtic Revival ইংরেজী সাহিত্যে কোন বিভেদ টেনে আনেনি। আয়ার্ল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য গড়ে তোলাই ছিল Yeats-এর কাম্য, যেমনি আমাদের প্রয়াস হবে মুসলমান জাতিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি করা। এজন্য বাংলা সাহিত্যের অতীতকে অস্বীকার করবার আবশ্যকতা নেই। Yeats, Douglas, Hyde, Lady Gregory এঁরা কেউ ইংরেজী সাহিত্যের অতীতকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন নি। মুসলমানেরা আরবী-ফারসী শব্দ দ্বারা বাংলা ভাষার কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ করবে এটাও একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। Celtic Revival-এর সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করেছিলেন এক প্রকার Anglo-Irish idiom. Anglo-Irish idiom ইংরেজী সাহিত্যকে দুর্বল করেনি ; বরঞ্চ এর শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছে। Synge-এর অপূর্ব ভাষার সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করেছেন ইংরেজী সাহিত্যিকেরাই। আমরা বাংগালী মুসলমানেরা Anglo Irish idiom-এর মত কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষা সৃষ্টি করিনি। এবং Celtic সাহিত্যিকদের তুলনায় আমাদের কর্মসূচীও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। হিন্দুরা যে-প্রকারে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ প্রবেশের পথ রোধ করতে চেষ্টা করেন, কোন ইংরেজী সমালোচক যদি সেই মানদণ্ডে তাঁর স্বদেশের সাহিত্যের বিচার করেন তবে The wanderings of Cisin Catinleen in Hulihan, riders to the sea. The playboy of the western world-এর মত বইকেও ইংরেজী সাহিত্যের

তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন কোন সমালোচকের মতামত এ রকমের হতে পারে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

যতই এ সম্বন্ধে চিন্তা করি ততই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের সাহিত্যিক আন্দোলনের বিরোধিতা করবার কারণ হিন্দুদের ভাষার কৌলীন্য রক্ষার বাসনা নয়, এ হিন্দু সমাজের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। মুসলমানেরা সাহিত্য অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠুক—এ তাঁদের কাম্য হতে পারে না। যদি আমরা নিজেরা একটা স্থির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হতে পারি তবে বহির্জগতের বিরোধিতা যে নিষ্ফল হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বিরোধিতার ভয়ে যে সমাজ পশ্চাদপসরণ করে তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। পথ দীর্ঘ হতে পারে, যাত্রা ক্লান্তিদায়ক হতে পারে এবং লক্ষ্য অত্যন্ত দূরবর্তী, তবু সম্মুখে এগিয়ে চলছি এই উপলব্ধি থেকেই আমরা বেঁচে থাকবার সাহস অর্জন করতে পারব। নিশ্চেষ্ট, নিষ্প্রাণ Hollowmen হয়ে থাকবার অভিপ্রায় আমাদের নেই—যাদের সম্বন্ধে T. S. Eliot বলছেন—

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
 Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
 For Thine is the Kingdom.

আমাদের মানসিক ক্লৈব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে; রাজনৈতিক জাগরণের সংগে সংগে একটা সাহিত্যিক জাগরণ আসাও অবশ্যসম্ভাবী।

এই সাহিত্যিক জাগরণের ধারা—যার সূচনা দেখতে পাই সারা বাংলা দেশে—কোন্ পথে প্রবাহিত হবে তা এখন বলা কঠিন। তবে মুসলমান জীবনের বিশিষ্ট ঐতিহ্য থেকেই যে এই জাগরণ তার প্রাণশক্তি সঞ্চয় করবে তা নিঃসন্দেহ। যে জাগরণের পশ্চাতে ঐতিহ্যবোধ নেই তা কোন দিন স্থায়ী হতে পারে না। ঐতিহ্যবোধ সম্বন্ধে T. S. Eliot বলছেন—

> A sense of history involves a perception not only
> of the lastness of the past but of its presence.

যে অতীত প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানকে প্রভাবান্বিত করছে এবং যে অতীত অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বর্তমানের ভিতর প্রবাহিত হয়ে আস্‌ছে—এ উভয়কেই আমাদের জানতে এবং বুঝতে হবে। অনুপ্রেরণার জন্য হয়তো আমাদের নির্ভর করতে হবে পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসের উপর। কিন্তু প্রয়োজন হলে আমরা ইস্‌লামের ইতিহাস মন্থন করে আমাদের সাহিত্যের উপকরণ সঞ্চয় করব।

এতদিন আমাদের সাহিত্যের কোন স্থির লক্ষ্য ছিল না। সেই জন্য আমাদের শক্তির অপচয় ঘটেছে অনেক। আমাদের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে যাতে একটা আদর্শ রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত করা যায়—তাই এই পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। বাংলার সমস্ত মুসলমান সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীর সহায়তায় আমাদের এ-আন্দোলন সফল হয়ে উঠুক, আমরা এই কামনাই করি।

[মোহাম্মদী; ফাল্গুন, ১৩৪৯] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

সম্পাদকের বিবৃতি

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

সাহিত্য-স্বষ্টিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য—একথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো। সাহিত্যের মধ্যেদিয়েই প্রত্যেক জাতি তার বিকাশের পথ খুঁজে পায়। পৃথিবীর বিচিত্র রস সম্ভোগ করতে যে পেরেছে তার পক্ষেই সাহিত্য-স্বষ্টি সম্ভব। জীবনের সত্যকে স্বীকার করে আপন পরিবেশের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করে সত্যিকার মানুষিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবার সাধনাই সাহিত্যিকের সাধনা। জীবনের সংগে সংযোগ আছে বলেই সাহিত্যের এত মর্যাদা। এর উদ্ভব হয়েছে জীবন থেকে—তাই যখন কোনো পুস্তক পাঠ করি তখন মুহূর্তেই আমরা জীবনের সংগে ব্যাপকভাবে, নিবিড়ভাবে ও উজ্জ্বলভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। একজন মানুষ তার জীবনে যা দেখেছে, যা উপলব্ধি করেছে তা সে শুধু আপনার জন্য রেখে দিতে চায় না। তার একান্ত নিজস্ব অনুভূতি অপরেরও মর্মানুবিদ্ধ হোক—এও তার একান্ত কাম্য। এ-কামনাই সাহিত্য-স্বষ্টির মূল উৎস। Arnold Bennett-এর এ-কথা খুবই সত্য :

> It is well to remind ourselves that literature is first and last a means of life and that the enterprise of forming one's literary taste is an enterprise of learning how best to use this means of life.

যারা বেচে থাকতে চায় না, যাদের কামনা-বাসনা স্বল্প সীমারেখায় আবদ্ধ, তাদের পক্ষে সাহিত্যকে অস্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। তারা জীবনের দ্যুতি দেখেনি, দেখেছে, তার কমপ্রবাহের নির্জীব অংশটুকু। তাই তারা যখন জীবনের সংগে যুক্ত থাকে, তখন জীবনকে প্রকাশ করতে পারে না, আর যখন কল্পনাজীবী হয় তখন তাতে জীবনের সত্য থাকে না। এজন্য সর্বশেষে বেহাগরাগিণীতে ব্যর্থতার অনুরণন তোলা ছাড়া আর

তাদের উপায় থাকে না—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে,
তাই আকাশ কুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী
কূল নাহি পায় আশার তরণী
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে ॥

এ ব্যর্থতার ক্লান্তি আমরা চাইনে। অনুপ্রেরণার জন্য যদি আমরা আমাদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে না। যে জীবনের সংগে আমাদের অংগাংগী সংযোগ তাকে এতদিন অস্বীকার করেছিলাম বলেই আজ আমাদের এত দুর্গতি। আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিক পারম্পর্য নেই। পুরোভাগে আলাওল অত্যন্ত অসংগতভাবে একাকী দণ্ডায়মান। পরবর্তী কোনো সাহিত্যিকের উপর তাঁর কোনো প্রভাব নেই। হিন্দুভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে যে বৈষ্ণব কবিতা তিনি লিখেছেন, ইসলামী কৃষ্টির সাথে তার কোনো একাংগতা নেই। মুসলমানী যে সমস্ত রচনা তাঁর আছে তা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি নয়, তা সর্বাংশে অনুবাদ।

আলাওল আমাদের স্বধর্মী এইটুকুই মাত্র তাঁর সংগে আমাদের সংযোগ; আমাদের সংগে তাঁর সংস্কৃতিগত সান্নিধ্য নেই, অত্যন্ত ক্ষমতাবান কবি হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ মর্যাদা তিনি পাননি শুধু এ জন্যই। নিধুবাবু-কবিকঙ্কন-ভারতচন্দ্র-কাশীরাম-কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো তা মুখ্যতঃ ও মূলতঃ হিন্দু তার সংগে আলাওল সাহিত্যের ভাবগত সংযোগ ছিলো। আলাওলের দিক থেকে এ-সংযোগে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না, কিন্তু হিন্দুরা শুধুমাত্র জাতিগত পার্থক্যের জন্য এ-সাহিত্য -ক্ষেত্রেও আলাওলের অন্তপ্রবেশকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেনি। তাই দেখতে পাই, বংগদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতেও আলাওলের কাব্যালোচনার ব্যবস্থা নেই; হিন্দু-সংকলিত কোনো কোনো সাহিত্য-ইতিহাসে তাঁর সাধারণ নামোল্লেখ আছে মাত্র। মুসলমানেরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাঁর সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় না,

হিন্দুরা তাঁর সাহিত্য স্থষ্টি সম্পর্কে পূর্ণভাবেই অজ্ঞ। আত্মপর সম্বন্ধে এদের চেতনা এত আশ্চর্যভাবে উগ্র যে, নিছক জাতিগত বৈষম্যের জন্য শ্রেষ্ঠকে তার যথাযথ মর্যদা দিতেও এদের কুণ্ঠা অপরিসীম। আলাওলের পরে দু-একজন মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব উনবিংশ শতকের শেষাংশে ঘটেছে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে তাঁদের কোনো স্থান নেই। এ ভাবেই অনেক মুসলমানের সাহিত্য অর্থহীন হয়ে আছে। মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক্, রেয়াজউদ্দীন, কায়কোবাদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো সে সময়ের বিচারে তা' পর্যাপ্ত হলেও তা'তে পূর্ণভাবে মুসলমান জাতির সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেনি। অনুকরণের বন্যা এসেছিলো তখন। জাতিগত অনুভূতি থেকে সে সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি, তাই নিছক রসবিচারে তার মর্যাদা যতই হোক না কেন, আমাদের প্রাণের সংগে তার সংযোগ সূত্র খুব ক্ষীণ বলে আজ সে-সাহিত্যের স্রষ্টারা যথাযথ প্রশস্তি পাচ্ছেন না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলেন নজরুল; মুসলমান জাতিকে নব প্রাণচেতনায় উদ্বোধিত করবার প্রয়াস করা হয় তখনই। এপ্রয়াস অর্থহীন হয়নি। নজরুলের সাহিত্যিক মূল্য যত তুচ্ছই হোক না কেন, এ প্রয়াসের সত্যিকারের উদ্বোধক হিসাবে তাঁর স্থান আজও নিঃসংশয়ে অনেকের পুরোভাগে।

আজ আমাদের প্রচেষ্টা হবে আমাদের স্থষ্ট সাহিত্যে আমাদের জীবনের সত্যকে জাজ্বল্যমান করা। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, যে-সাহিত্যের সাথে আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোন সম্বন্ধ নেই, সে সাহিত্য সৌন্দর্য স্থষ্টি করতে পারে সত্য, কিন্তু তা' আমাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, আমাদের আত্মার কাছে সে সাহিত্য মূঢ় ও নির্বাক। সর্ববন্ধনহীন সাহিত্য এক বিরাট অর্থহীন উচ্ছ্বাস মাত্র। যে-সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি নেই, মানব-প্রকৃতির বিচিত্র সমস্যার আলোচনা নেই, সে সম্পর্কে রুডলফ্ অরফেন লিখেছেন—

> Art of this type may make great discoveries in the sphere of sense-experience; it may be able to enrich and perfect our sensibility in undreamt of fashion; it may reveal in the overcoming of difficulties but it can bring but little benefit to the human soul, and it will not be able perceptibly to elevate spiritual life.

আমাদের সাহিত্য আমাদের জীবনের আলোচনা করবে, আমাদের প্রকৃতি ও বাইরের সমাজের ভিতর যে ভাব ও চিন্তার আলোড়ন চল্‌ছে সে আলোড়নের মধ্যে আমাদের গন্তব্যপথ নির্ণয় করবে, আমাদের জীবনকে বিবিধ চাঞ্চল্য থেকে রক্ষা করে ধ্রুব আদর্শের দিকে প্রেরণ করবে, সর্বশেষে আমাদের সমাজকে নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করবে। অরফেনের কথা আবার উদ্ধৃত করতে হয়—

> Literature has an obvious task. It should help to clarify our ideas to bring to clear expression all that is around us and within us to point out simple lines of development amidst the chaos of appearances with which we are surrounded. It should as far as possible gather life into a whole and at the same time assist in the work of developing it. For this purpose it has need of an inner superiority to raise it above the oppositions of the age, of an energetic synthesis which can reject as well as absorb, of a powerfully progressive spiritual creation.

আমাদের জীবন সম্বন্ধে একটা গভীর সত্যবোধের পরিচয় যদি আমাদের সাহিত্যে থাকে, তবে তখনই তা' মূল্যবান হবে, অন্যথায় নয়। এমন উর্ধ্বদৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনা আমরা চাইনে, যার সৃষ্টিমূলে জগতের ছায়াটি পর্যন্ত নেই। বাস্তবতাকে বাদ দিলেও আদর্শের গোড়ায়ও বাস্তবানুভূতি—perfected experience—থাকবেই, তা' না হলে সে আদর্শ ভ্রান্তিপদ। কোনো ভাব বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে না। কাব্য ও সাহিত্য লোকোত্তর চমৎকার বটে, কিন্তু বাস্তবকে সে মহিমামণ্ডিত করে বলেই তাকে আমরা মর্যাদা দিই। নিত্যকার ধারণা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে আজ আমাদের সাহিত্যে রূপায়িত করে তুল্‌তে হবে, তা' নাহলে আমাদের কল্যাণ নেই। ধ্যানমৌন সন্ন্যাসীর তত্ত্বরসের সন্ধান নাইবা রাখলাম, জীবনকে যদি পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি, তবে সার্থক হব, নিশ্চয়ই সার্থক হব। ইসলাম জীবনের বিবিধ সংঘাতকে স্বীকার করেই মুক্তি খুঁজেছে, বৈরাগ্য তাকে কখনো অভয় দেয়নি। মায়াবাদ আমাদের জন্য নয়; we will drink life to the less. দৈন্যপীড়িত ও নির্জীব হয়ে আমরা আর থাকতে চাইনে। জীবনের সুখদুঃখ প্রবাহে নিরন্তর আবর্তিত হয়ে নূতন সম্পদে

আমরা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করব। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে যে একটা দিব্যচেতনার আবেশ রয়েছে তাকে নাইবা অনুভব করলাম, কোন প্রকারের মোহময় তন্ময়তা আমাদের নাইবা এল, যদি স্বসমাজের পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি আমাদের সাহিত্যে তবে তাতেই থাক্‌বে অনিত্য-নিত্যের সংযোগে এক সুষমামণ্ডিত আভা। অর্থহীন ভাবমার্গে স্বপ্নপ্রয়াণ করা ভ্রান্তিবিলাসের নামান্তর মাত্র।

[মোহাম্মদী : ফাল্গুন, ১৩৪৯] **সৈয়দ আলী আহ্‌সান**

সভাপতির অভিভাষণ

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ ।]

অভ্যর্থনা সমিতির শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সদস্যগণ এবং সমবেত সাহিত্যিক বন্ধুগণ।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এই প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচিত করে আপনারা যে সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করেছেন, একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। কারণ আমি জানি, আমার ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র এবং আমার অপেক্ষা যোগ্যতর সাহিত্যিকের অভাব মোটেই ঘটেনি। তবু আপনাদের এ-কাজ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ দিয়েছে এইজন্য যে, আমার মনে সংশয় নেই: আমি আপনাদের প্রীতি, স্নেহ ও বন্ধুত্ব লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়েছি। তাই আপনাদের নির্দেশ মাথায় করে ঢাকায় ছুটে এসেছি নিজের অযোগ্যতা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করিনি। এখন আমার কথা যদি আপনাদেরকে আনন্দ দিতে না পারে, তবে সে দোষ আমার নয়—আপনাদের নির্বাচনের। আমি আপনাদের বন্ধুত্বের গৌরব নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল আছি।

ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের সদস্যবৃন্দ দেশের এই সংকট সময়ে এ অধিবেশনের আয়োজন করে সত্যই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ দুঃসাহসের মধ্যে দিয়ে তাঁদের যে সাহিত্য-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, তা সানন্দ অভিনন্দন-যোগ্য। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য শুধু আইন সভার সাধারণ নির্বাচন নয়, সামরিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকে আমাদের অনেক কর্মধারা, এমন কি, সাহিত্যিক কর্মধারা পর্যন্ত, কিছুটা স্তম্ভিতগতি। কিন্তু ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুগণ এই দুঃসময়েও সাহিত্য-উৎসবের আয়োজন করেছেন—না করে পারেননি। সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধ কতটা আন্তরিক ও আবেগময় হলে এ সম্ভব হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুত: পাকিস্তান শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে। মুখ্যত: পাকিস্তান এদেশের রাজনৈতিক সত্তাকে ঘা মেরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে আঘাতের বেদনা জাতীয় সত্তার মর্মস্থল সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। জাতিত্বের হারা অভিমান আজ সম্বিৎহারা মুসলমানের রাজনৈতিক কর্মসাধনায় স্ফূর্ত হতে চাইছে বটে, কিন্তু সাহিত্যিক ও দার্শনিক রূপায়ণের ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা না থাকলে তা জীবনের ক্ষেত্রে দানা বেঁধে উঠ্তে পারে না। বড় রাজনৈতিক বিপ্লবের পেছনে তার সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি থাকবেই। ফরাসী বিপ্লবের পেছনে ছিল রুশো-ভল্‌টেয়ারের দর্শন, ভিক্‌টর হিউগের সাহিত্য, রুশ-বিপ্লবের পেছনে ছিল মার্কসের দর্শন, টলস্টয়-তুর্গেনিভ-ডস্টয়ভস্কী-গোর্কীর সাহিত্য। পাকিস্তান পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক সত্তার মূলে যখন নাড়া দিতে পেরেছে, তখন এর সাহিত্যিক দার্শনিক রূপায়ণ অবশ্যম্ভাবী। মহাকবি ইকবালের কাব্য ও দর্শন ইতিপূর্বেই চিন্তা জগতে পাকিস্তানের পরিবেশ সৃষ্টি করে-ছিল—কিছুটা নজরুলের আগেকার কাব্যরচনা ও বাংলায় পাকিস্তানী পরিপার্শ্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। ঐ আবেষ্টনের মাঝে রাজনীতিক্ষেত্রে যখন পাকিস্তানের ডাক এলো, এবং সে ডাকে ভারতের একটা বিরাট মানব-সমবায় সাড়া দিয়ে উঠলো তখন সাহিত্যেও ব্যাপকভাবে তার প্রভাব অনুভূত না হয়ে পারলো না।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কোলাহলের বাইরে যে-সাহিত্যিক সুধীমণ্ডলী স্বকীয় অন্তর্লোকে ইন্দ্রজালরচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা সচকিত হয়ে উঠলেন। এ-ডাকতো শুদ্ধমাত্র বাইরের কোলাহলকে জিয়িয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পরি-কল্পিত নয়—অন্তরের সাথেও যে এর যোগ রয়েছে। এ যে আত্মশক্তি উদ্বোধনের আহ্বান। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই মুসলমানদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে তা তো নয়—জীবনের সবক্ষেত্রেই যে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে, তাদের সাহিত্যিক কাংগালপনা যে দুরপনেয় লজ্জার কারণ হয়ে রয়েছে, এ তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান সংখ্যাগুরু হলেও সাহিত্যে তাদের দান নগণ্য, এ-কলংক ঢাকবার উপায় কি?

কিন্তু কেন এমন হলো ? ইংরেজ আমলের আগে সাহিত্যে বাংলার মুসলমানের দান কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এ-কথাতো বলা চলে না। তারা আলাওল, সৈয়দ হামজা, তার লোক-সাহিত্য, পুথি-সাহিত্য, তার মারফতি সাহিত্য, ভাটিয়ালীগান হিন্দুর চণ্ডীদাস-ভারতচন্দ্র, পদাবলী সাহিত্য, বাউল-রচনা, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির চাইতে কোনো অংশেই তো হীন ছিল না। প্রাথমিক যুগে মুসলমানের নওয়াব-বাদশাহগণই বাংলা সাহিত্যের মুরুব্বী ছিলেন। যে-যুগে হিন্দু পণ্ডিতরা বাংলা সাহিত্যকে আটপৌরে রচনা বলে ঘৃণা করতেন, তখন মুসলমান নওয়াব-বাদশাহ্‌রাই আর মুসলমান সাহিত্যিকরাই এর পরিচালনের ভার গ্রহণ করে তাকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে তখন মুসলমানেরাই বান ডাকিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চেহারা দেখলেই, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের রচনার চেহারা লক্ষ্য করলেই মুসলমান প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। আলাওল-ভারতচন্দ্রের রচনায় খুব বেশী তফাৎ নেই। তবে পুথি সাহিত্যের রচনায় কিছুটা বেশী আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বটে।

কিন্তু ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষার গুরুতর রূপান্তর ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ধারা যে সহজ স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চলছিল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে গতিকে কৃত্রিম উপায়ে সংস্কৃতানুসারী করার প্রয়াস পান। পলাশীর বিপর্যয়ে দিশে-হারা মেরুদণ্ডভাঙা মুসলমানদের তখন এর প্রতিবাদ করারও শক্তি ছিল না। তাদের সাহিত্য-চর্চার খেয়ালও তখন একরূপ লোপ পেয়েছিল; ফলে সেই থেকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অমুসলমানদেরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি শক্তিশালী অমুসলমান সাহিত্যিকদের সাধনায় বাংলা সাহিত্য যে রূপ গ্রহণ করল মুসলমানের ভাবধারা ও জীবনযাত্রার সাথে তার কোনো সম্বন্ধ-সংস্রব ছিল না।

অনেকদিন পরে পলাশীর আঘাত গা-সহা হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন মুসলমানের সাহিত্য-চর্চার খেয়াল ধারণা ফিরে এলো, তখন তাঁরা যে বাংলা সাহিত্যের সাক্ষাৎ পেলেন, তা তাঁদের ধারণা-রুচিতে যতই বিসদৃশ লাগুক, এর প্রভাবমুক্ত হয়ে চলার ক্ষমতাও তখন তাঁদের ছিল না। ফলে অনুকরণ-অনুসরণই তাঁদের সাহিত্যিক উপজীব্য হয়ে পড়ল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধারার সাথে যোগসূত্র রেখে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির সামর্থ্য তখন তাঁদের ছিল না। দীর্ঘদিনের যোগসূত্রহীনতার ফলে অভিনব ও বিসদৃশ পরিপার্শ্বের মাঝে নবীন সাহিত্য ব্রতীর ভেতর মৌলিক প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব নয়।

কাজেই 'মেঘনাদ বধে'র অনুকৃতি 'কাসেম-বধ', 'গীতাঞ্জলী'র অনুকৃতি 'প্রেমাঞ্জলী, 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুসরণে রচিত 'রায়-নন্দিনী' প্রভৃতি কাব্য-উপন্যাস মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলো বটে, কিন্তু মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হলো না। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যুগপ্রবর্তক সাহিত্য স্রষ্টার প্রভাব কাটিয়ে চলার ক্ষমতা নিয়ে কোন মুসলমান সাহিত্যিক আবির্ভূত হলেন না। নজরুল ইসলামে ও জসীমুদ্দীনে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নজরুল ইস্‌লামও গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও এদিক দিয়ে আশা-ভরসার কোন লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ছে না। আগেকার মুসলিম সাহিত্যিক্‌রা যেমন মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন আধুনিক মুস্‌লিম সাহিত্যিকগণও তেমনি বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র মিত্র, বা বিষ্ণুদে-সুধীন দত্তের অনুসরণ করেছেন। কথাসাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বকীয়তা ফোটাবার যথেষ্ট সুস্পষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু সেখানেও আমরা পরানুকারিতার গড্ডালিকাই দেখ্‌তে পাই। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্‌' ও আবুল মনসুর আহ্‌মদের 'আয়না' ছাড়া মুসলমান কথা-লেখকদের স্বকীয়তা কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যে-কোনো গল্পের বই বা উপন্যাস পড়লেই মনে হয়: নায়ক-নায়িকাদের মুসলমান নামগুলি কেটে যদি সেখানে হিন্দু নাম বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে হিন্দুরচিত কথা-গ্রন্থের সাথে এদের কোনো পার্থক্যই থাকবে না।

মুসলমানদের সাহিত্য রচনায় এই যে মৌলিকতার অভাব এবং পরানু-কারিতার প্রভাব, এর মূলে সক্রিয় হয়েছে inferiority-complex এবং আত্মশক্তি সম্পর্কে চেতনার অভাব। চেতনার এই অভাব পলাশীর বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ মুসলমানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পাকিস্তান রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমানকে নবজীবনে উদ্বোধিত করেছে। এ যেনো তড়িৎ-চাবুক হেনে মুসলমানের পরানুকরণ মোহগ্রস্ততা দূর করেছে।

কোথায় গেল তার কংগ্রেসানুসারিতা, কোথায় গেল তার প্রভুশক্তির পদ-লেহিতা! সে যেন একদিনেই বুঝতে পারল: শক্তির জন্য এতদিন নিজের অন্তর দেশের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা না করে বাইরে বাইরে কোথায় সে বাউণ্ডেলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। অনন্তশক্তির উৎস যে তার নিজেরই অন্তর দেশ—স্বকীয়তার উদ্বোধনেই যে তার পরিপূর্ণ মুক্তি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তার এই আত্মোপলব্ধি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত না হয়ে পারে না। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই আত্মোপলব্ধিরই প্রকাশ হচ্ছে: পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী, পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ। শুধু কলকাতা ও ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলহট প্রভৃতি স্থানেও ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা ও আসামের অন্যান্য স্থানেও যে সাহিত্যে এ আত্মোপলব্ধির প্রাতিষ্ঠানিক নিদর্শন অচিরে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

এই যে আত্ম-চেতনা, এ যেনো স্বপ্ন জগতে ইন্দ্রজাল রচনায় ব্যস্ত লোকের হঠাৎ চোখ মেলে উজ্জ্বল দিবালোক দর্শন! স্বপ্নের ঘোর কাটতে কারুর কারুর দেরী হতে পারে, কিন্তু ঘোর যাদের কেটে গেছে, উজ্জ্বল দিবালোকের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে বিচরণে তাঁদের আগ্রহ দুর্দমনীয় হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। এই দুঃসময়েও ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুদের কর্মাবেগ যে দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে, তার মূল কারণ এখানেই। তাঁদের সাহিত্যানুভূতির উপর রেনেসাঁর যে উজ্জ্বল আলোকসম্পাত হয়েছে তাতে করে সেখানে একটা তড়িৎস্পন্দন সূচিত হয়েছে এবং বাইরে তার আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই তড়িদ্‌গতি আবেগের মুখে কোথায় ভেসে গেছে আগেকার সাহিত্য-সমাজ! সেখানে এসেছে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ। এ না এসে পারেনি—যে পাকিস্তান সাহিত্যে স্বকীয়তার বাণী নিয়ে এসছে, তাকে সুস্পষ্টভাবে এর গায়ে চিহ্নিত করে রাখার প্রয়োজনও অনুভূত না হয়ে পারেনি।

সাহিত্যে যে স্বকীয়তার ও স্বচ্ছতার নকীব হয়ে এসেছে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, তার আবেগের প্রথম ব্যাপক প্রকাশই হচ্ছে এই সাহিত্য সম্মেলন। কিন্তু এই সম্মেলনের অধিবেশনেই যে তার বিরাট কর্তব্যের ইতি হবে না, তা বলাই বাহুল্য। এ সবে মাত্র তার শুভ সূচনা। পূর্ব-পাকিস্তানের যে-সব সুধী সাহিত্যিক এ সম্মেলনে তশরীফ এনেছেন, এ শুভ-

সূচনাকে সফল করে তোলার ভার তাঁদের উপর। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতির সঠিক নির্ধারণে সর্বোতভাবে চেষ্টা করবেন, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য এ-যাবৎ যে অনুকরণ-অনুসরণের পথ বেয়ে চলেছিল, তাকে আত্মস্থ করার উপায় নির্ধারণই হবে তাঁদের প্রধান কর্তব্য।

এ কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ বর্ষণের ধৃষ্টতা আমার নেই। এখানে বহু যোগ্যতর সাহিত্যিক উপস্থিত আছেন—তাঁরাই এ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি শুধু এ-সম্পর্কে আমার কয়েকটি বক্তব্য বিনীতভাবে উপস্থিত সুধী সাহিত্যিকগণের খেদমতে পেশ করতে চেষ্টা করব। তাতে যদি তাঁদের কর্তব্য নির্ধারণের পথ কিছুটা সুগম হয়, তবেই আমি ধন্য হব।

প্রথমত: সাহিত্য সার্বজনীন হলেও তার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভংগী দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট হতে বাধ্য। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম, কৃষ্টি, সমাজ-ব্যবস্থা জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদির দিক দিয়ে এতই বিভিন্ন যে, এদের সাহিত্যিক রূপায়ণ এক হতে পারে না। কিন্তু বিশিষ্ট রূপায়ণ নিয়েও তাঁদের সাহিত্য সার্বজনীন হতে পারে এবং বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে বরেণ্য আসন লাভের অধিকারী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তেমনি হচ্ছেন মহাকবি ইক্‌বাল। কিন্তু উভয়ের সাহিত্যিক বিষয়বস্তু ও তার প্রকাশভংগী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন হিন্দুত্বের বাণীকেই তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশ ক্ষমতায় করে তুলেছেন সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি—অন্যজন তাঁর অপরূপ প্রকাশভংগীর ভিতর দিয়ে ইস্‌লামের মর্মকথাকেই পরিণত করেছেন বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পদে।

ইংরেজ আমলের বাংলা-সাহিত্যে হিন্দুর রচনায় যে স্বকীয়তা ও স্বস্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, মুসলমানের রচনায় তার একান্ত অভাব। অথচ সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের স্বস্থতারই প্রকাশ, তার স্বকীয়ত্বেরই স্ফূর্তি। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের রচনায় এই অভাব অতি উৎকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইস্‌লামের জন্য হা-হুতাশের প্রাচুর্য হয়তো তাতে আছে, কিন্তু স্বকীয়তার অভাবের জন্য এ প্রাণহীন তাতে নেই আন্তরিকতা, যার অভাবে সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্যই হতে পারে না। বাংলা

ভাষী মুসলমানের আধনিক কালের সাহিত্য স্বষ্টি এই কারণে যেনো বাংলা সাহিত্যে পরগাছা সৃষ্টিই হয়ে আছে। কি কাব্যে, কি কথা সাহিত্যে সর্বত্রই মুসলমানের এই দুর্দশার চিহ্ন সুস্পষ্ট। নিজত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধির অভাব ও পরানুকারিতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার এই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি।

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ এই অভাবের দিকেই মুসলমান সাহিত্যিকদেরকে সচেতন করে তুলবেন। কি বিষয়বস্তুতে, কি প্রকাশ ভংগীতে, সাহিত্যে মুসলমানের নিজত্বের প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হবে, তার নির্ধারণে সাহিত্য-সংসদের মনোযোগ দিতে হবে। মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবন-যাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা। অনুকরণ-অনুসরণে এ সম্ভব নয়। আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার সৃষ্টিক্ষমতা এর জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টিক্ষমতা অবশ্য প্রতিভাশালীতেই সম্ভব। প্রতিভা সুলভ নয় মানি, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তবে প্রতিভা সুলভ না হলেও একান্ত দুর্লভও হবে না। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ এই পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টিতে মনোযোগী হতে পারেন—যে পারিপার্শ্বিকতায় সাহিত্য সম্পর্কে মুসলমান লেখকদের আত্মোপলব্ধি ঘটবে যাতে করে তারা পরানুকারিতা ও স্বকীয়তার প্রভেদ বুঝতে পারবেন। এর পরে প্রতিভার আবির্ভাব দূরবর্তী হওয়ার কথা নয়।

বাংলা সাহিত্যে ভক্তি ও দাস্যভাবের ছড়াছড়ি। চরণ-ধূলোয় মাথা নত করার বাণীই নাকি বাংলা সাহিত্যের মর্মকথা। মাথার উপর বোমা-ফাটাফাটির যুগেও বাংলার রেডিয়ো অশ্রান্তভাবে চরণতলে মাথা নত করা ও আত্মসমর্পণের গীতই শুনিয়ে যাচ্ছে। 'এ যেন কানুছাড়া গীত নেই' এ ধরনের ব্যাপার আর কি! এর ফলে বাংলা রেডিয়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের হানাহানির মধ্যে এই দাস্য ও আত্মসমর্পণের চীৎকার হাস্যকর ও অসহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুসলমান ভক্তি ও দাস্যভাবের উপাসক নয়—নির্বাণের বাণী তার অন্তর ধর্মের সাথে খাপ খায় না। সে শক্তিবাদের উপাসক—সাম্য-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব তার জাতীয় জীবনের মর্মকথা। তাই তার কাব্যের, গানের সুর হবে

বাংলার প্রচলিত সুর থেকে ভিন্ন। এই দিক দিয়ে বাংলার কাব্য ও সংগীত সাহিত্যকে নবরূপে রূপায়িত করার ভার মুসলমানদের। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এর পরিবেশ সৃষ্টিতেও যত্নবান হবেন। শুধু সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, বাংলা ভাষার নবরূপায়ণেও মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেক কিছু করবার আছে। মুসলমানের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্র অংকনে মুসলমান সাহিত্য-স্রষ্টা মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু নূতন শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী করতে পারেন, বাংলা ভাষাকে নব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন। বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী ও নব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করার গুরুদায়িত্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের। সাহিত্য-সংসদ এদিকেও সাহিত্যিকদিগকে সচেতন করবেন—প্রচলিত শব্দ ও উপমার চর্বিত চর্বণ না করে নূতন শব্দ ও উপমার ব্যবহারের দিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। এই দিক দিয়ে পুথিসাহিত্য মুসলমান সাহিত্যিকদিগকে প্রেরণা যোগাতে পারে। এতে কেউ যেনো মনে না করেন: আমি মুসলমান সাহিত্যিকদেরকে পুথি-সাহিত্যের ভাষা অবিকল গ্রহণ করতে বলছি। আমার উদ্দেশ্য তা নয়, আর এতদিন পরে তা সম্ভবও নয়। তবে পুথি-সাহিত্যের ধারা থেকে মুসলমান একেবারে বিযুক্ত হতে পারে না। সে সাহিত্যের আধুনিক যুগোপযোগী বিবর্তিত ধারা আমাদের গ্রহণযোগ্য হতে পারবে কিনা, সে সম্পর্কে বিবেচনার আবশ্যকতা আছে বৈ কি! নজরুল ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগের রচনার ভাষাকে এই বিবর্তনের ফল বলে অভিহিত করলে, আমাদের মতে, অসংগত কিছু বলা হয় না। সে-ভাষা যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল তাতে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? সাহিত্য-সংসদ ভাষা সম্পর্কে এদিক দিয়েও চিন্তা করতে পারেন।

তা' ছাড়া বাংলা ভাষার বানান ও বর্ণমালা সম্পর্কেও মুসলমান সাহিত্যিকদের চিন্তা করার অবসর আছে বলে আমরা মনে করি। যে-সব আরবী-ফারসী শব্দ ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষার অংগীভূত হয়ে গেছে এবং পরেও যেসব শব্দের বাংলা ভাষায় প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, তাদের সুষ্ঠু বানান সম্পর্কে মুসলমান সাহিত্যিকদের দায়িত্ব অনেকখানি। বানান-বিভ্রাট ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। কাজেই এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সাহিত্য-সংসদকে অবহিত হতে হবে বৈ কি!

আর বাংলা বর্ণমালা? এ এক গুরুতর ব্যাপার! এত অনাবশ্যক অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় ভিড় করে আছে যে, অনেকগুলিকে বিদায় কবার আশু-প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মোহবশতঃ স্বভাবতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সাহিত্যিকদের এ-ব্যাপারে কুণ্ঠা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিক জানেন: বাংলা ভাষা একটা মিশ্র স্বতন্ত্র দেশজ ভাষা—সংস্কৃতের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। শুধু তাই নয়, পরোক্ষ যোগও অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজেই অনাবশ্যক অক্ষরের মোহ তার থাকতে পারে না। এ-কাজে অমুসলমান পক্ষ থেকে তীব্র চীৎকার উঠ্‌বে জানি, কিন্তু অনাবশ্যক অক্ষরমুক্ত বাংলা বর্ণমালার নূতন চেহারা পরিণামে তাঁরাও প্রীতির চোখে না দেখে পারবেন না, তাও জানি। বিদেশী শব্দের আমদানীতে বাংলা সাহিত্যের জাত গেছে বলেও চীৎকার উঠেছিল। কিন্তু সে চীৎকার এখন থেমে গেছে—বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করতে অমুসলমান সাহিত্যিকরাই এখন অগ্রণী হয়ে উঠেছেন।

বলবার কথা আছে আরো অনেক। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের সম্মুখে সাহিত্য সম্পর্কে আরো বহু সমস্যাও সমাধানের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমার ক্ষমতা নগণ্য ও সীমাবদ্ধ। সে সবের আলোচনা যোগ্যতর সাহিত্যিকরাই করবেন। আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দেবার এত কিছু আছে যে, তার ফলে সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে। আত্মশক্তি সম্বন্ধেও এতদিন সচেতন ছিল না বলেই মুসলমান সাহিত্যিকের দানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারে নি। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিক আজ সচেতন এই জন্যই সাহিত্যে রেনেসাঁর বাণী কণ্ঠে নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের আত্ম-প্রকাশ। মুসলমানের দানে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁ যে আসবেই—নবসৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য অপরূপ নবকলেবর লাভ যে করবেই, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

[মোহাম্মদী: ফাল্গুন, ১৩৪৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীন

আলোচনা

[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা]

ঢাকার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ঢাকার সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, প্রকাশ, ইতিপূর্বে ঢাকায় আর কোনো সাহিত্য-সম্মেলনেই এমনটি দৃষ্ট হয় নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ ঢাকার সাহিত্যিক সমাজে একটা নবজাগরণ আনিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতিপূর্বে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের কথা প্রায়ই শোনা যাইত। অনুকূল সমালোচনার চাইতে উহার বিরুদ্ধে সমালোচনাই বেশী হইত। মুসলিম সমাজ, মুসলিম জীবনযাত্রা প্রণালী—এমন কি মুসলিম ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি এই সাহিত্য-সমাজের প্রধানগণের লেখায় এমন সব কটু মন্তব্য মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত যে, তার ফলে সাধারণ-ভাবে ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ ধারণাই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মনে হয়, এই কারণেই সাহিত্য-সমাজ ঢাকার সাহিত্যিকদের সমর্থন ও সহানুভূতি ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে; ফলে, গত কয়েক বৎসর সাহিত্য-সমাজের কোনো সাড়াশব্দই আর পাওয়া যায় নাই। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, সাহিত্য-সমাজ আর ঢাকার মুসলিম-সাহিত্যিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না—সাহিত্য সম্পর্কে নূতন Lead অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময়ে পাকিস্তানের আহ্বান সমস্ত ভারতীয় মুসলমানকে সচকিত করিয়া তুলিল। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বস্বতার বাণী লইয়াই যদিও পাকিস্তান আসিল, কিন্তু এর প্রভাব সাহিত্যের উপরও স্বাভাবিকভাবেই পড়িল। মুসলমান সাহিত্যিকরা বুঝিতে পারিলেন, শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা এ যাবৎ পরানুকরণই করিয়া আসিয়াছেন। বাংলা

সাহিত্যসেবী মুসলমানগণও বুঝিতে পারিলেন : সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁদের যে হরিজনের মতো অবস্থা, তারও মূলে আছে তাদের সাহিত্য-স্থষ্টিতে এই স্বস্থতার অভাব ও পরানুকরণের প্রভাব। এই অনুভূতি হইতেই কলিকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী' এবং ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ' জন্মলাভ করিল। শুধু কলিকাতায় ও ঢাকায় নয়, বাংলার অন্যান্য স্থানেও পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী গঠনের সংবাদে মনে হয় : বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক সমাজে একটা নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে—অনুকরণ-অনুসরণের ভিতর দিয়া নয়, নব-স্থষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

[মোহাম্মদী : চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে সংগৃহীত]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

[১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ]

হাজেরান বন্ধুগণ,

আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির উপর আপনাদেরকে খোশ-আমদেদ জানাবার ভার পড়েছে। যোগ্যতর ব্যক্তির উপর এ-গুরুভার পড়লে শোভন ও সংগত হতো। নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল থেকেও যে এ-ভার গ্রহণ করেছি, সে এইজন্য যে, যে উদ্দেশ্যে এই জলসা আহূত হয়েছে এবং যার আলোচনার জন্য আজ আপনারা মেহেরবানী করে এখানে তশ্‌রীফ এনেছেন, সে সম্পর্কে আমার আন্তরিকতা ও ভাবাবেগ অভ্যর্থনা সমিতির আর সব বন্ধুর কারুর চাইতে কম নয়। আপনাদেরকে খোশ আমদেদ জানানো উপলক্ষ করে আমি আমার সে আন্তরিকতা ও ভাবা-বেগের কথাটা প্রকাশ্যে জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছি। এক সংগে হালুয়া-রুটী খাওয়া ও সওয়াব হাসিল করার মতো আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এবং আমার আন্তরিকতা ও ভাবাবেগ প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভের এই মহা সুযোগ গ্রহণের লোভ সংবরণ করতে পারিনি। আশা করি, আপনারা সে জন্য আমার গোস্তাখী মাফ করে নেবেন। আপনাদেরকে যথাযোগ্যভাবে সংবর্ধনা জানাতে পারবো সে বিশ্বাস আমার নেই। তবু এ-ব্যাপারে আন্তরিকতার পুঁজি আমার কারুর চাইতে কম নয়, এ-কথা সগর্বেই ঘোষণা করতে পারি। সেই আমার অকৃত্রিম আন্তরিকতার পুঁজির উপর দাঁড়িয়ে আমি অভ্যর্থনা-সমিতির তরফ থেকে আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি : খোশ আমদেদ বন্ধুগণ ! আপনাদের আগমনে পূর্ব-পাকিস্তানের এ মহতী জল্‌সা সত্যই গুল্‌জার হয়ে উঠেছে। এখন যে জন্য আমরা আপনাদেরকে ডেকে এনেছি, সে-কথাটা বলা যাক। পূর্ব পাকিস্তান কথাটা শুনেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের সীমা-সরহদ্দের একটা গুরুতর পরিবর্তন আমরা চাই। শুধু

সীমা-সরহদ্দের পরিবর্তনই নয়, সেই পরিবর্তিত অঞ্চলের পূর্ণ আজাদীও আমাদের কাম্য। কেন চাই সীমা সরহদ্দের পরিবর্তন, আর কেনই বা সেই পরিবর্তিত অঞ্চলের পূর্ণ আজাদী আমাদের পরম কাম্য হয়ে উঠলো, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আপনারা এই জলসার মূল-সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখা-সভাপতির মুখেই বিস্তারিতভাবে শুনবেন। এখানে শুধু এইটুকুই আরজ করতে চাই যে, এই সীমা-সরহদ্দের পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তিত অঞ্চলের পূর্ণ আজাদী ব্যতিরেকে এখানকার ছয় কোটি মানুষের মুক্তি নেই, কল্যাণ নেই। শুধু রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলছিনে—আর্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক—কোনো আজাদীই সম্ভবপর নয়।

আজাদী মানুষের জন্মগত অধিকার। এ-অধিকার লাভের জন্য মানুষ দরকার হলে জীবনভর সংগ্রাম করে। আমরাও সংগ্রাম করে চলেছি। কিন্তু এখনো আজাদী আমাদের মিলেনি। আজাদী লাভের সর্বপ্রচেষ্টা আমাদের এ-যাবৎ ব্যর্থতা বহন করেই এসেছে। কিন্তু ব্যর্থ হলেও সে-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে: আমাদের চেষ্টায় গলদ আছে, আমরা ঠিক পথে সংগ্রাম চালাতে পারিনি—তাই আজাদী আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা শিখেছি: স্বকীয়তার উপর দাঁড়ানো ব্যতিরেকে আজাদী মেলে না—পরানুকরণে পরবশতাই শিকড় গেড়ে বসে। অনুকরণে সৃষ্টি সম্ভব নয়—আত্মশক্তির উদ্বোধন ব্যতিরেকে আজাদী লাভ অসম্ভব। আজাদী একটা সৃষ্টি—আজাদী স্বকীয়তা সাপেক্ষ।

এ-যাবৎ আজাদীর লড়াইয়ে আমরা ভারবাহীর ভূমিকা অভিনয় করেছি মাত্র—আত্মশক্তির খোঁজ নিইনি। রাজনীতিতে যেমন, শিক্ষা, তমদ্দুন, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতিতেও তেমনি আমরা অপরের তল্পীবাহীর কাজ করে গিয়েছি মাত্র। কাজেই সর্বাংগীন পরবশতার অক্টোপাস ছিন্ন করে আমরা আজাদ হতে পারিনি। তাই আমাদের মনুষ্যত্বের সত্যকার বিকাশ ঘটেনি—আমরা মানবক হয়েই আছি। কিন্তু আমরা যে আজাদ-মানুষ হয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের সত্যকার বিকাশ ঘটাতে চাই, তা চিহ্নিত করে দিয়েছি আমরা আজ এই পূর্ব-পাকিস্তান কথাটার গায়ে। পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক অঞ্চলগত সীমা-সরহদ্দের ব্যাপার নিশ্চয়ই—কিন্তু তা-ই তার সবটুক কথা নয়। ওর ভেতরকার আসল কথা হচ্ছে,

এই পরিবর্তিত ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী মুসলমান আজ তার সত্যকার আজাদীর উৎসমূলের খোঁজ পেয়েছে—inferiority complex ঝেড়ে ফেলে সে আজ আত্মশক্তির উপর দাঁড়াতে যাচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান কথাটা অপরের কাছে বেয়াড়া রকমের উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু এই অঞ্চলের মুসলমানের স্বকীয়তার বিদ্যুৎগর্ভ বাণী এর ভেতরে লুকিয়ে আছে, তাদের আজাদীর আবেহায়াতের সন্ধান এ দিয়েছে। শুধু এ-অঞ্চলের মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নয়, তাদের সাহিত্যিক, শৈক্ষিক, তামদ্দুনিক, আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের সঞ্জীবনী মন্ত্রও এতে সংগুপ্ত আছে। পূর্ব-পাকিস্তান ভারতের পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগুরু অধিবাসী মুসলমানের সর্বাংগীন স্বাতন্ত্র্যের জীবন-বাণী বহন করে এনেছে। আমাদের যে সোসাইটি বা সংঘের উদ্যোগে আজ এ-জল্সার অধিবেশন, সে এ জীবন-বাণীকেই এ-অঞ্চলের মুসলমানের জীবন-ধারায় রূপায়িত করে তুলতে চায়। তাই তার নামের পূর্বে এ পূর্ব-পাকিস্তান অভিধান। কিন্তু আমাদের এ সোসাইটির সাথে বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার কোনো সম্পর্ক নেই। সোসাইটীর লক্ষ্য বাস্তব রাজনৈতিক কর্মপন্থা অনুসরণ নয়—পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের জীবন-বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার রাজ-নৈতিক কর্মসাধনা এ-সোসাইটির কাজ নয়। এ-সোসাইটি উক্ত জীবন-বাণীকে তাদের চিন্তাক্ষেত্রে মাত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমরা জানি: বাস্তব রাজনৈতিক কর্মপন্থা অনুসরণ ও তার সাফল্য ব্যতিরেকে পূর্ব-পাকিস্তানের বহিরাংগিক আজাদী সম্ভব নয়। কিন্তু সে গুরুদায়িত্ব দেশের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের হস্তেই ন্যস্ত থাকুক। আমাদের সোসাইটী সে-ব্যাপারে নাক প্রবেশ করাতে চায় না। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী চায় পর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীর বুদ্ধির মুক্তি—তার চিন্তারাজ্যে অরাজকতার অবসান। আপনারা নিশ্চয়ই এ-কথা অস্বীকার করবেন না যে বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে এবং চিন্তারাজ্যের অরাজকতার অবসান না হলে, মানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি না ঘটলে, কোনো জাতির বহিরাংগিক মুক্তিও সম্ভব হয় না। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের বহিরাংগিক মুক্তি, মানে রাজনৈতিক আজাদী সত্যকারভাবে আসতে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তার অধি-বাসীর মনের মুক্তি, মানে চিন্তারাজ্যের অরাজকতা দূর হচ্ছে। আমাদের সোসাইটি জাতির এই মনের মুক্তি আনবারই সাধনা করছে।

এই যে মনের মুক্তি, এ হচ্ছে রেনেসাঁর ব্যাপার। জাতির চিন্তা-রাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটনের নামই রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী, তা-ই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যৎকে বরণ করে। তাই রেনেসাঁ মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপ্লব। আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীর চিন্তা-রাজ্যে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই আনতে চাই। তাই আমাদের সংঘের নাম পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী।

জাতির রাজনৈতিক মুক্তিই সর্বাংগীন জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তির বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ তাই সাহিত্য, তমদ্দুন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। পর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এই কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক, সাহিত্যিক, তামদ্দুনিক চিন্তাধারায় বিজ্ঞান-সম্মত নির্দেশ প্রদান করে তাদের মধ্যে পূর্ণ রেনেসাঁ আনতে চায়।

আমাদের এ সোসাইটীর পূর্ব-পাকিস্তান এই অভিধানেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন: আমরা এ-অঞ্চলের রাজনৈতিক চিন্তারারাকে কোন্ পথে প্রবাহিত করতে চাই। আমার এ-অভিভাষণের গোড়াতে তার একটুখানি আভাসও আমি দিয়েছি। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি এখানে করবো না। আপনারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণেই তার বিস্তৃত পরিচয় পাবেন। শুধু এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমরা এ-সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন চাই। পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এ-যাবৎ ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রথমে আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী

সত্যকার আজাদীর কথা—রেনেসাঁর কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুলপথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী। এক মুহূর্তে জাতি আপন স্বস্থতা ফিরে পেয়েছে—পরানুকরণের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে। সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব পুথি-সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছুদিন বিজাতীয় উর্দু ভাষার মোহে কাটিয়েছি। তারপর শুরু হল অনুকরণের পালা। সে অদ্ভুত কসরৎ এখনো চলছে। তবে সে কসরতের হাস্যকরতার উপলব্ধি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী আমাদের সাহিত্যে স্বস্থতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। পুথি ও লোকসাহিত্যে পুরাপুরিভাবে প্রত্যাবর্তনে সে-স্বস্থতা, স্বকীয়তা আসবে না। কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা, রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুথি ও লোক-সাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যিক কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে। আপনারা সাহিত্য, পুথি-সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত ও ভাষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পাবেন। কাজেই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে—তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষা-নীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। এ-সব ক্ষেত্রেও আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাঁদরে পরিণত হয়েছিলাম। কাজেই রেনেসাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে।

কিভাবে তা সম্ভব হবে, বিভিন্ন সভাপতিদের অভিভাষণে আপনারা তার আভাস পাবেন। বন্ধুগণ, আপনারা এর থেকেই বুঝতে পারবেন, কত বড় গুরু জাতীয় প্রয়োজনে এ সম্মেলনে আপনাদের ডাক পড়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী এ সব ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান উপদেশ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে। আপনাদের উপদেশে, সহযোগিতায় পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটীর সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারবে, এ-আশা একান্তভাবে মনে পোষণ করছি বলেই আপনাদের এ-তকলিফ দিতে সাহসী হয়েছি।

ডেকে এনে আপনাদের তকলিফ দিয়েছি, এ-কথা শুধু বিনয় করেই বলছিনে। নিজেদের আয়োজনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়েই এ-কথা না বলে আমি পারছিনে। এ-সম্মেলনের আয়োজন আমরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেই করবো বলে সংকল্প করেছিলাম। তা যদি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হতো তবে আপনারা যে খুশী হতেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু নানা অপরিহার্য সংকট আমাদের সে আয়োজন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সে সংকটের একটা হল এই যুদ্ধসংকট। এর ফলে আয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যক অনেক জিনিসপত্র আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। এতে করে আমাদের আয়োজনে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য হল।

আমাদের ইচ্ছা ছিল: সম্মেলন হলটিকে আমরা এমন ভাবে সাজাব যাতে করে এ-হলে ঢুকেই যেনো সকলে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটীর আদর্শের স্বপ্ন হলের চারদিকে রূপায়িত দেখতে পান। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল—হল-সজ্জায় তা রূপায়িত করা আর সম্ভব হল না। এ অবশ্য আমাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। যুদ্ধসংকটই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী; ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব আমাদের আয়োজনের এ-দিকটাকে অসম্পূর্ণ রেখেছে। হল-সজ্জার যেটুকু আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে, তা অবশ্য দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত ব্যাপার, আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনাদের ক্ষমার দৃষ্টি লাভ করবে, এ আশা অবশ্য আমরা রাখি।

এ ছাড়া, বাংলা ও আসামের প্রতি জেলা থেকে পল্লী গায়কদের এনে পূর্ব-পাকিস্তানের তামদ্দুনিক দিকটার একটা পূর্ণ চেহারা আমরা

আনন্দ মজলিসের আসরে ফুটিয়ে তুলব, এ-আকাঙক্ষা আমাদের ছিল। এদিক দিয়ে আমাদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এ-কথা অবশ্য বলতে পারিনে। কিন্তু আমাদের আশা-মাফিক কাজ হয়নি, লজ্জার সংগে তা আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। যুদ্ধসংকট এরও পরোক্ষ কারণ। তা'ছাড়া এরজন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। অর্থ অবশ্য আমরা কিছু পেয়েছি, কিন্তু সে এমন বিপুল নয়, যা এই বিরাট প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। আমরা মাত্র মোমেনশাহী ও রংপুর থেকে কয়েকজন পল্লী শিল্পী নিয়ে আসতে পেরেছি। কাজেই আমাদের এ তামদ্দুনিক আসর সমগ্র বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে এ-কথা বলতে পারিনে। আমাদের এ-ত্রুটিও আপনারা রহম নজরে দেখবেন, এই আশাই করছি।

কাজেই এ-সম্মেলনকে আমরা যেভাবে, যে-মনোহররূপে আপনাদের সুমুখে উপস্থাপিত করব ভেবেছিলাম, তেমনটি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। অবশ্য প্রাথমিক চেষ্টায় এ-ধরনের অসম্পূর্ণতা ত্রুটি থাকবেই। আর এ-সম্মেলনে যে একটা অভিনব ব্যাপার এবং ভারতে এ-ধরনের সম্মেলন যে এই প্রথম, তা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করবেন। একটা জাতির চিন্তারাজ্যে এমন আমূল পরিবর্তনের কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে এমন সম্মেলন যে অন্ততঃ বাংলায় আর কখনো হয়নি, এ-কথা একরূপ জোর করেই বলা চলে। কাজেই প্রাথমিক চেষ্টায় দোষ-ত্রুটি যা কিছু হয়েছে, তা আশা করি, আপনাদের ক্ষমা পাবার একেবারে অযোগ্য বিবেচিত হবে না।

এ-সম্মেলনের উদ্যোগ--আয়োজনের ব্যাপারে আমরা সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী, যুবক, ছাত্র প্রভৃতি বন্ধুর নিকট থেকে যে বিপুল সাড়া পেয়েছি, তা বস্তুতই অভূতপূর্ব। তাঁরা আমাদের কাজে যে-ভাবে সাহায্য, সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন, তেমনটি পূর্বে কখনো আশা করতে পারিনি। যাঁদের কাছেই গিয়েছি, তাঁরাই আমাদের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনেছেন এবং আমাদের সোসাইটীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শকে নিজেদের বলে মেনে নিয়েছেন। আমাদের এ বিরাট চেষ্টার ক্ষেত্র যে এমন উর্বর হয়ে আছে, এমনটা আমরা আগে ধারণাই করিতে পারিনি। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি মনে করেই আমরা এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। দু'বৎসর আগে আমাদের সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হলেও এই

কারণেই আমরা এমন ব্যাপকভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে এতদিন ভরসা পাইনি। অবশ্য কলিকাতার নিরাপদতার অভাবের জন্যও আমরা আগে ইচ্ছা-সত্ত্বেও এ-কাজে হাত দিতে পারিনি। যাহোক, এ-বার কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলুম, ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত—আমাদের আশংকার কোনো কারণ সত্যই নাই। কলিকাতার এই সব সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বন্ধুদের আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের অনেকেই আজ এ-সম্মেলনে তশরীফ এনেছেন। তাঁদের সাহায্য-সহানুভূতি আমাদের বল দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। আর যুবক ও ছাত্রবন্ধুদের যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য-সহানুভূতি আমরা পেয়েছি, সেজন্য তাঁদের জানাই আমাদের অন্তরের প্রীতি। মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিগণ যে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান অভিভাষণ প্রদান করে আমাদের এ-সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এখানে তশরীফ এনেছেন, এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার উৎস তাঁদের দিকে স্বতঃই উৎসারিত। বন্ধুদের জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ—জানাই তাঁদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ।

আর বাংলার সুদূর পল্লী থেকে যে-সব গায়ক শিল্পীবন্ধু আমাদের এ-সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে বহুত বহুত তকলিফ স্বীকার করে এখানে এসেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। সম্মেলনের জৌলুস তাঁরা নিঃসন্দেহে বাড়িয়েছেন। তাঁদের জানাই সাদর সংবর্ধনা।

উপস্থিত সুধী, সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী, শিল্পী, গায়ক প্রভৃতি সকলের সমবায়ে আমাদের এ-সম্মেলনক্ষেত্র সত্যই বাগে এরেমে পরিণত হয়েছে—এ-সম্মেলন-হল গুলজার হয়ে উঠেছে। তাঁদের সকলকে জানাই খোশ আমদেদ।

এইবার মূল সভাপতি বরণের পালা। যিনি আজ এ-সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, বাংলার সর্বত্র তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই তাঁর পরিচয় প্রদান এক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর। আমি এখন অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে তাঁদের নির্বাচিত মূল-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করে সম্মেলন পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

[মোহাম্মদী : শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১] আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মূল সভাপতির অভিভাষণ

[১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত মূল-সভাপতির অভিভাষণ]

হাজেরানে মজলিস,

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর এই পয়লা বৈঠকের সভাপতি মনোনীত করে আপনারা আমাকে সরফরাজ করেছেন। সেজন্য আপনারা আমার শুকরিয়া জানবেন। এ জল্সা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই পয়লা বৈঠক নয়, এ ধরনের সম্মেলন সারা ভারতেও এই প্রথম। কাজেই এই সম্মিলনীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে শুরুতেই কিছু আরজ করা দরকার। এই সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি সাহেব এ-বিষয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছেন। তিনিই পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটীর অন্যতম মূল প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ। সুতরাং এ-ব্যাপারে কথা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী তাঁরই। তাঁর মুখে আপনারা যে-সব মূল্যবান কথা শুনেছেন, সে-সব আমি আর দুহ্‌রাতে চাই না। আমি আরেক দিক থেকে দুচারটি কথা আরজ কচ্ছি।

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মর্ম-কথা বুঝতে হলে 'পাকিস্তান' ও 'রেনেসাঁ' দুটি কথারই তাৎপর্য গওর করে বুঝতে হবে।

পয়লা ধরা যাক 'পাকিস্তানের' কথা। 'পাকিস্তান' মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবী। মুসলিম লীগই মুসলিম-ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত্র, এ-কথায় যাঁদের সন্দেহ রয়েছে তাঁদেরও নিশ্চয় এটা জানা আছে যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর যে-সব রাজনৈতিক দল মুসলমান সমাজে রয়েছে, তাঁরাও প্রকারান্তরে ও ভাষান্তরে পাকিস্তানেরই কথা বলছেন। সুতরাং পাকিস্তান দাবীকে নিঃসন্দেহে মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলা যেতে পারে। তবু এই পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতিক মহলে তর্ক-বিতর্কেরও সীমা নেই; রাগারাগি-গালাগালিরও অন্ত নেই। কিন্তু এ হল্লা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ এটা একটা নয়া কথা। নতুন যতই দরকারী

ও স্বাভাবিক হোক, বিনা প্রতিবাদে বিনা-হল্লায় কেউ কখনো তাকে গ্রহণ করেনি। মা যেমন করে দামালকের মধ্যে নয়া শিশু প্রসব করেন, জাতিও তেমনি দামালকের মধ্যেই নয়া চিন্তা প্রসব করে। রাজনৈতিক মহলে আমরা আজকের দিনে যে দামালক দেখছি, আমরা সাহিত্যিকরা এটাকে তাই জননীর প্রসব-বেদনার চীৎকার বলেই দার্শনিক নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করেছি।

কারণ, রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমী। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা, সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র-নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য—বাঁচা ত পরের কথা—জন্মাতেই পারে না।

রাজনৈতিক 'পাকিস্তান' নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা এইজন্য যে, এতে হিন্দু ও মুসলমানকে এক রাজনৈতিক জাত বলা হচ্ছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা আলাদা জাত কিনা, তা নিয়ে হয়তো তর্কের অবকাশ আছে ; কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা যে আলাদা জাত, এতে কোনো তর্কের জায়গা নেই। এই সম্মিলনীর তাহজিব-তমদ্দুন শাখার সভাপতির ভাষণ থেকে আপনারা তা ভাল করেই দেখতে পাবেন। এ-কথা মানি যে, হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমদ্দুনে একশো-একটা মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে প্রচুর। একথা আপনারা সবাই জানেন যে, জীবে জীবে, জাতিতে জাতিতে এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও মিলটাই সত্য নয়, গরমিলটাই সত্য। কারণ ঐটেই সত্তা। ঐটুকু থেকেই একেক অন্য থেকে আলাদা করে চেনা যায়। 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে একশো একটা মিল রয়েছে। তার তুলনায়, গরমিল কতটুকু? তবু আমরা 'আমি' ও 'তুমির' বিচার করি ঐ গরমিলটুকু দিয়েই—মিলটুকুন দিয়ে নয়। এমন কি, মানুষে-পশুতেও গরমিলের চেয়ে মিলের সংখ্যাই কি বেশী নয়? তবু ঐ গরমিলটুকুকেই আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব করে থাকি। সংস্কৃতির ব্যাপারটাও এই, মূলতঃ শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই এক। তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতি-গত পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। হরেক জাতির

রাজনৈতিক আজাদী নিশ্চয় হবে অদূরাগত ভবিষ্যতের যুগ-বাণী। কিন্তু সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্থকতা হবে জাতির স্বাধীন স্বকীয় নিরংকুশ বিকাশে। এই বিকাশের মর্মবাণীই হচ্ছে তমদ্দুনী আজাদী বা কাল্চারেল অটনমী। এরই নাম পাকিস্তান। কৃষ্টিগত পরসহিষ্ণুতা পাকিস্তানের বুনিয়াদ। 'লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন'—তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার, কোরআনের এই উদার বাণীই পাকিস্তানের গোড়ার কথা। ভারতের বুকে এ বাণী স্পন্দিত হয়েছে, ভারতের মাটিতেই এর পরখ হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক-একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ও মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। পদ্মফুল ও বস্রাই গোলাপ যেমন করে একই বাগিচায় নিজ নিজ স্থানে প্রস্ফুটিত হতে পারে ভারতের বুকেও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম-সংস্কৃতিকে নিজ নিজ স্বকীয়তায় বাড়তে দিতে হবে। যাঁরা অতীতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিকে ভেঙেচুরে এক করতে চেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বল্তে বাধ্য, তাঁরা ঠিক কাজ করেননি। ঠিক কাজ করেননি এইজন্য যে, তাঁরা চেয়েছেন এই উভয় সংস্কৃতিকে তাদের প্রাণ-ধর্ম বা ফাণ্ডামেন্টাল থেকে বিচ্যুত করতে। তাঁরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছেন বলেই যুগে যুগে সে চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় মনীষা তাতে নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আজ পাকিস্তানবাদের উদ্ভব হয়েছে।

অনেক বন্ধুর ধারণা, পাকিস্তান আন্দোলনটা প্রগতি বিরোধী। কারণ এতে জোর দেওয়া হচ্ছে ধর্মোন্মাদনার দিকে এবং এতে করে উপেক্ষা করা হচ্ছে বিজ্ঞান, প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধিকে। বন্ধুদের একথা শুধু যে স্থূলদর্শী ও অবাস্তব, তা নয়; কথাটা অবৈজ্ঞানিকও বটে, অনৈতিহাসিকও বটে। কারণ কোনো জাতি বা মানব-গোষ্ঠীই নিজের সংস্কৃতিকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে প্রগতির পথে এগুতে পারে না। যারা সে চেষ্টা করে, তারা অনুকরণ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না। দুনিয়ার প্রগতিতে কোনো দান করতে তারা পারে না। অতএব সংস্কৃতিই হচ্ছে সকল জাতির জীবন সাধনার বুনিয়াদ। আর সংস্কৃতিই হচ্ছে ধর্ম-বীজেরই ফুলে-ফলে সঞ্জীবিত জীবন্ত গাছ। কিন্তু ঐ কথাকথিত প্রগতিবাদী বন্ধুরা কথাটা সহজে বুঝতে চান না। তাঁরা বলেন: বিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা মানব-মন যতই বিকশিত হবে, ধর্মীয় বাধা-বন্ধ ও সীমা-সরহদ্দ ভেঙে ততই মানব এক-ধর্মী হয়ে যাবে।

তারা তখন স্থানীয় ও জাতীয় ধর্ম ছেড়ে এক উদার, ডগ্‌মাহীন ধর্ম গ্রহণ করবে। সে ধর্মের নাম হবে হিউম্যানিজিম।

কথাটা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়। যাঁরা মানুষের প্রাণধর্মে বিশ্বাসী নন, যাঁরা যন্ত্রধর্মে বিশ্বাসী, তাঁরাই মানুষের মধ্যে এই যান্ত্রিক ইউনিফরমিটী আনতে চান। অনেক দেশে, অনেক জাতিতে এ মতবাদের পরখ হয়েছে। ইউরোপের পরখটা ত সেদিনকার কথা। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার গোড়ামির বিরুদ্ধে তৎকালের চিন্তানায়করা যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা হিউম্যানিজম নামক নয়া ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা বেশী দিন টেকেনি। টেকেনি এইজন্য যে, ওটা স্বাভাবিক নয়। বাস্তব মানব-জীবনের সংগে ও মতবাদের কোনো যোগ নেই। তাই পণ্ডিতে-ভরা ইউরোপের বুকেও আজ ঐ মতবাদের প্রসার নেই। আল্‌ডুয়াস হাক্সলী প্রভৃতি জনকতক সাহিত্যিক আজো হিউম্যানিজমের গান গাইছেন বটে, কিন্তু সে গান জোরালো কোরাস গান নয়, উহা গতায়প্রায় ক্ষীণকণ্ঠের বহুদূর-নিঃসৃত রেশ মাত্র। বস্তুতঃ প্রাণ-ধর্মই জীবন-ধর্ম ; যান্ত্রিক ঐক্য বা মিকানিক্যাল ইউনিফরমিটী জীবন-ধর্ম নয়। তাই শুধু ইউনিফরমিটী দিয়ে ধর্মের প্রাণ যাচাই করা চলে না। শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসান দিয়ে ধর্মের বিচার করলে, সে আর ধর্ম থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসাদারী ; শুধু শরীর দিয়েও ধর্মের বিচার করলে, ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় প্যাগানিজম। তা যদি হয়, তবে সে-ধর্মে তত্ত্বজ্ঞান বা মেটাফিজিক্স শুভঙ্করীর আর্যার কাছে হয় পরাজিত। মানুষ যতই স্বার্থপর ও ক্ষুধার্ত হোক, তার দৈহিক প্রয়োজন যতই দুর্বার হোক, তার কলেক্‌টিভ মন ও সমষ্টিগত সত্তা আত্মার দৈন্য ও শূন্যতা বেশীদিন বরদাশ্‌ত করতে পারে না। কারণ মানুষ আর যাই হোক একটা যন্ত্র মাত্র নয়, তার একটা প্রাণ আছে।

সোজা কথায় সমস্ত দুনিয়ার পশু-পক্ষী ও গাছ—পালার জন্য যেমন একই মাটি ও একই আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না, তেমনি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই কালক্রমে সমস্ত ধর্ম ভেঙে এক হিউম্যানিজ্‌ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে, এবং সমস্ত সংস্কৃতির আইল ভেঙে একই সংস্কৃতির বিশ্ব—জোড়া মাঠ তৈরী হবে, এ আশা যাঁরা কচেছন, তাঁরা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার কচেছন। কাজেই এ-বাণী ভবিষ্যৎ

বিশ্বের বাণী হতে পারে না। যদি সে—চেষ্টা হয়, তবে সেটা হবে কাল্‌চারেল ফ্যাশিজম বা তমদ্দুনী জুলুমবাজী। তার চেয়ে বরঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চল ও আবহাওয়ার মানব-গোষ্ঠী নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে আত্মবিকাশ করবে; প্রগতি ও কল্যাণের পথে হবে তাদের ভেতর সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা; খোদার বিচিত্র দুনিয়ায় রচিত হবে কল্যাণ-মুখী বৈচিত্র্যের এক বাগিচা। এইটাই ত সহজ, এ-ই ত স্বাভাবিক; এই ত বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র-দর্শনের কথা নয়, এটা জীবন-দর্শনের কথা। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের জীবন-বাণী নয়; শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলিমেরও বাণী নয়; পাকিস্তান সারা দুনিয়ার অদূরাগত ভবিষ্যতের বাণী।

এইবার আসুন পূর্ব—পাকিস্তানে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়, এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি এক একটা আস্ত জাত? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক—একটা আস্ত কৃষ্টি? তা নয়। আরবী, তুর্কী, ফারসী, আফগানীরা এক মুসলমান হয়েও এক জাত নয়। ইংরাজ, ফরাসী, ইটালী, জার্মান এক খ্রীস্টান হয়েও এক জাত নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জন্ম। গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে; সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না, বরঞ্চ সে--সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ। এইখানেই পূর্ব--পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা, এইজন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত। ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণে এই দিকটার সুন্দর আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন।

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী তাই পূর্ব-পাকিস্তানেরই রেনেসাঁ আন্‌তে চায়। পূব-পাকিস্তান একটি ভৌগোলিক ইউনিট; কিন্তু সাহিত্যিকের চোখে, বিপ্লবীর বিচারে, মানুষ ছাড়া ভূগোলের কোনো আলাদা সত্তা

নেই। তাই রেনেসাঁ সোসাইটী পূর্ব-পাকিস্তান বল্‌তে এই ইউনিটের বাশিন্দাদেরই বুঝে থাকে। সোসাইটী তাই ভূগোলের নয়—মানুষের রেনেসাঁ আনতে চায়। এখন প্রশ্ন উঠেঃ রেনেসাঁ কাকে বলে? জাতির মরা হাড়ে জীবনের বিদ্যুৎ চম্‌কানোকেই আমরা এক কথায় রেনেসাঁ বলে থাকি। রাষ্ট্রে-সমাজে, শিল্পে-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, এক কথায় জীবনের সকল স্তরে, বিপ্লব আনার নাম রেনেসাঁ। অনেক বন্ধু বলেছেনঃ বিপ্লব আনবে, তবে রিভলিউশন বল্‌ছো না কেন? কেউ কেউ আবার বলছেনঃ জাতিকে জাগাবে, ত রিফরমেশন বা রিভাইভ্যাল নাম না রেখে সোসাইটীর নাম 'রেনেসাঁ রাখলে কেন?

এর উত্তর খুবই সোজা। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী 'রিভলিউশন সোসাইটী' হয়নি এইজন্য যে রিভলিউশন দ্বারা আমরা সাধারণতঃ রাষ্ট্রবিপ্লব বুঝে থাকি। কিন্তু আমরা সাহিত্যিক—আমরা রাষ্ট্র-নেতা নই। কাজেই আমরা শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবে সন্তুষ্ট হতে পারি না, আমরা চাই জাতির সর্বাংগীন বিপ্লব। আর সে বিপ্লব হবে জনগণের কল্যাণে রূপায়িত—শুধু রাষ্ট্র-রূপের বিবর্তনে অথবা রাষ্ট্র-নেতার হাতফেরিতে পর্যবসিত হবে না সে বিপ্লব। রিভলিউশনে যে রাষ্ট্র রূপায়ণ হবে, তাতে গণ-কল্যাণ হতেও পারে—নাও হতে পারে। তাতে বিপ্লবীরও জয় হতে পারে —আবার প্রতি-বিপ্লবীরও জয় হতে পারে। কিন্তু রেনেসাঁর পথে যে সর্বাংগীন জল্‌জলা পয়দা হবে, তাতে এ-ডিক্টেটর বা ও-ডিক্টেটরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না—প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব। সে রাষ্ট্রে তখন এ শাসক, ও শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে স্বরাট, সকলে হবে সমান। সে রাজ্যে এ ধনিক আর ও শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না। সব ধনের মালিক হবেন আল্লাহ্‌। আর আল্লার ধনের ভোগী হবে তার সকল বান্দা। এইজন্য রেনেসাঁ সোসাইটী রিভলিউশনের চেয়ে রেনেসাঁয় বেশী বিশ্বাসী।

তারপর রিফরমেশন নয় কেন? রিফরমেশন ধর্মীয় সংস্কারের কথা। আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। ধর্ম আমাদের দীনে-মোকাম্মেল। কোনো রিফরমেশনের এতে দরকার নেই; কোনো সংস্কারের এতে গুঞ্জায়েশ নেই। ইউরোপে রিফরমেশনের দরকার পড়েছিল। কারণ খ্রীস্টধর্ম সেখানে স্বরূপ হারিয়ে গোঁড়া কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের ইসলামে তা হয়নি। এর চারপাশে অনেক আগাছা—আবর্জনা জন্মা নিয়েছে সত্য, কিন্তু কালের বিবর্তন, ভূগোলের পরিবর্তন, রাজার রাজদণ্ড কিছুই ইস্‌লামকে তার স্বকীয়তা থেকে হটাতে পারেনি। কাজেই আমাদের ধর্মে সংস্কার বা রিফরমেশনের দরকার নেই।

তারপর ধরুন, রিভাইভ্যালিজমের কথা। রিভাইভ্যালিজমটা হচেছ 'ফিরে-চলোর' ডাক, 'গয়িংব্যাকের' আহ্বান। আমরা কোথায় ফিরে যাব? দিল্লী-আগ্রার তখতে-তাউসে ফিরে যেতে পারবো না। বাগদাদ-দামেস্কের খেলাফতেও ফিরে যেতে পারবো না। সে আশা হবে বাতুলতা, আর সে-চেষ্টা হবে আত্মঘাতী। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারবো না, প্রগতিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। সেটা হবে আত্মহত্যারই শামিল। বিগত গৌরবের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তারূপে মুসলমান ছিল দুনিয়ার শিক্ষক। ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল তারা বিশ্বের নেতা, প্রগতির ছিল তারা অগ্র-পথিক। এ-যুগে আমাদের সে-গৌরবে ফিরে যেতে হলে ও সে নেতৃত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আমাদের চল্‌তে হবে যুগের আগে-আগে—প্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে রওয়ানা হলে চলবে না। কাজেই রিভাইভ্যালিজমের পিছন-ফেরা ডাক আমাদের আদর্শ হতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানের জাগরণের জন্য তাই রেনেসাঁ অপরিহার্য। এটা আমরা বুঝতে পারি ইউরোপের রেনেসাঁর বিচার করলে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাক্কালে খ্রীস্টান জাতি সমূহের যে চরম দুরবস্থা হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দাদেরও আজ ঠিক সেই দুরবস্থা।

ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল কখন? খ্রীস্টীয় পনর শতকে ইউরোপ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত। দুশো বছরের জেহাদে সারা ইউরোপের খ্রীস্টান রাজশক্তি মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির হাতে পরাজিত। পোপের আধিপত্য ও রোমক সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড। বিশ্বব্যাপী খ্রীস্টাধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চুরমার; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে খ্রীস্টজগৎ তখন মুসলিম জগতের অনুসারী ও অনুগ্রহ ভিখারী। অশিক্ষা, কুসংস্কার, আত্ম-কলহ, গৃহ-বিবাদে খ্রীস্টান ইউরোপ তখন ছিন্নভিন্ন। এই চরম বিপদের দিনে মুসলিম শক্তি খ্রীস্টান ইউরোপের মনে কঠোর আঘাত হান্‌লো কনস্টান্টিনোপল দখল করে। রোমের খ্রীস্টান সম্রাটরা এই কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী করে সারা ইউরোপ ও এশিয়ার উপর

রাজদণ্ড চালাবেন বলে পরিকল্পনা রচনা করে আস্‌ছিলেন। ১৪৫৩ খ্রীস্টীয় সনে এই কনস্টন্টিনোপলই মুসলমানরা দখল করে নিল। খ্রীস্টান সম্রাটের সাধের কনস্টান্টিনোপল তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হল ইসলামী রঙে রঞ্জিত কস্তন্‌তুনিয়ায়। এই চরম আঘাতে ক্লান্ত, অলস ও তন্দ্রাগ্রস্ত খ্রীস্টান-মনে যে তীব্র বেত্রাঘাত হল, তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে এল খ্রীস্টান-মনে অফুরন্ত যৌবনের জোয়ার। এই দিন থেকে শুরু হল তার রেনেসাঁ।

স্বভাবতই ইতালীতেই এ রেনেসাঁ হল। ১৪৯২ সালতক এই পঞ্চাশ বছর একা ইতালীই খ্রীস্টান ইউরোপের নওজোয়ানীর পতাকা বহন করে এল। তারপর ঐ সালে অষ্টম চার্লস্ নেপল্‌স্ আক্রমণ করে ইতালীর দরজা ফরাসী-জার্মান, স্পেন-পর্তুগাল ও ইংরাজ-ওলন্দাজের জন্য খুলে দিলেন। ঐদিন থেকে ইতালীর অর্ধ শতকের রেনেসাঁ সাধনার অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হতে লাগ্‌লো সারা ইউরোপে। সমগ্র খ্রীস্টান-জগৎ নব-জাগরণের গানে মুখরিত হল; নব-অভ্যুত্থানের কাজে তারা মেতে উঠলো।

এ-সাধনা চললো প্রায় একশো বছর। তার ফলে দেখা দিল আধুনিক যুগ। সমগ্র ইউরোপের রং চেহারা গেল একদম বদলে। দেখ্‌-দেখ্‌ করে খ্রীস্টান ইউরোপ হয়ে উঠলো সারা দুনিয়ার নায়ক, শাসক ও শোষক—ফ্রেণ্ড, ফিলসফার এণ্ড গাইড। যে ইতালীয় শিল্প, জার্মান বিজ্ঞান, স্পেনীয় নৌবহর, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপকে দুনিয়ার বাদ্‌শা বানিয়ে দিল, তা এই রেনেসাঁরই সৃষ্টি।

তবেই দেখা যাচেছ্ যে, মধ্যযুগের আঁধার থেকে মডার্ন এজের আলোতে আসার যে আধ-আলো আধ-আঁধার পথটুকু, ইউরোপের বেলা তারই নাম রেনেসাঁর যুগ। এ রেনেসাঁর কোনো সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা বৃথা। একে শুধু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এই বলে যে, অতীতের সংস্কার মোহ্ এবং তজ্জনিত দুর্বলতা কেটে উঠবার যে প্রবল বাসনা নও-জোয়ানীর উন্মাদনায় রূপায়িত হয়, সেই নব-উদ্‌গত কর্ম-উন্মাদনার নাম রেনেসাঁ। নতুন দৃষ্টিতে আল্লার দুনিয়াকে দেখা, তাঁর সৃষ্টি-রহস্যের কুদরতের সূর্য-কিরণে নিজেদের কুসংস্কারের জোনাকীর ঝিকিমিকি ভুলে যাওয়ার নামই মানব-মনের রেনেসাঁ। মনের রেনেসাঁ একবার এসে পড়লে কর্মের রেনেসাঁ আস্‌তে বাধ্য। জীবন্মৃত, লাঞ্ছিত, কোণঠাসা খ্রীস্ট-জগৎ এই রেনেসাঁর

পথেই আজ দুনিয়ার নেতা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতিকেও অমনি করে রেনেসাঁর পথেই নও-জোয়ানী লাভ করতে হবে। পনর শতকের খ্রীস্টান ইউরোপের সংগে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির আজিকার দুর্দশার তুলনা করুন। আঠারো শতকে এরাই বাংলার শাসক, নায়ক, ফ্রেণ্ড, ফিলসফার এণ্ড গাইড। বাংলার শিল্প-সাহিত্য তাহ্‌জিব-তমদ্দুন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-পালন সবই এদের হাতে। হঠাৎ একদিন পলাশীর ময়দানে এদের বিশ্বজয়ী শানিত তল্‌ওয়ার বেঈমানী ও জালজুয়াচুরির মুখে ভোতা হয়ে গেল। বিশ্বাস-ঘাতকতায় রাজ্য গেল; ভাষা পরিবর্তনে চাকরি গেল; বাজেয়াফ্‌তিতে জমিদারী গেল; পোশাক পরিবর্তনে খান্দানীর গৌরবটুকুরও অবসান হল। আগের দিনের বাদশা পরের দিনে পথের ফকির হল। গতকালের পণ্ডিত আজকার মূর্খ বনে গেল। বহু যুগের খান্দানী ভদ্রলোক একরাত্রে চাষী ছোটলোক হয়ে গেল। শিক্ষা-সভ্যতায়, শিল্প-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সিনেমা-থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে কোথাও আজ তাদের দেখা পাবেন না। রাজ-দরবারে তাদের স্থান নাই। তাদের ভিড় দেখুন গে' কাদা-নর্দমায়, নদী-নালায়। তাদের কাতার দেখুন গে' জমিদারের কাছারীতে, মহাজনের আঙিনায়। তাদের মিছিল দেখুন গে' শহর-বন্দরের ফুটপাথে। কুসংস্কারে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আত্ম-কলহে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, নিজের শক্তি ও গৌরব এদের অজ্ঞাত; নিজের অধিকারে এরা উদাসীন, এদের সংখ্যা চারি কোটী। সমগ্র ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ফ্রান্সের সমান।

এই বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, আত্মভোলা জাতকে বাঁচাবেন আপনারা দু'চারটা চাক্‌রী দিয়ে? দু'চারটা স্কুল কলেজ খুলে? আইন সভায় দু' দশটা প্রস্তাব পাশ করে? তা হয় না। এদের মুক্তি, এদের আজাদী আন্‌তে হলে চাই সর্বগ্রাসী বিপ্লব। সে-বিপ্লবের আগুনে জুলুম ও বেইন্‌সাফীর সমস্ত জঞ্জাল-আবর্জনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। কচুরী-পানা পোড়াতে গেলে ধান-টানও কিছু পোড়া যায় নিশ্চয়। তেমনি রেনেসাঁর আগুনে সামাজিক জুলুমের জঞ্জাল পোড়াতে গেলেও থোড়া-বহুত ভাল জিনিসও পোড়া যাবে নিশ্চয়। ভুতুড়ে বাড়ী ভেঙে নয়া বাড়ী তৈরী করতে গেলে অমন কিছু থোড়া-বহুত ভাল জিনিসেরও মায়া আমাদের কাটাতেই হবে।

তবেই আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের আজাদীর জন্য রেনেসাঁর পথে যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এটাও আপনারা বুঝতে পারছেন যে রেনেসাঁ একটা তামাশার ব্যাপার নয়। এটা জাতীয় জীবনের একটা গুরুতর নৈষ্ঠিক সাধনার ব্যাপার, একটা সার্বজনীন কর্মোন্মাদনার ব্যাপার; জাতীয় নওজোয়ানীর পাহাড়-ভাঙা পর্বত-ডিঙানো দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপার।

এটা কেমন করে ঘট্‌তে পারে? কথায় কথায় যাঁরা বিপ্লবের বুলি আওড়ান, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা মানব-মনের রহস্য উপেক্ষা করে থাকেন। বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁরা ভুলে যান। চিন্তার রাজ্যে, জাতির কলেক্‌টিভ মনে বিপ্লব না এলে কর্মে বিপ্লব আস্‌তে পারে না। চিন্তায় বিপ্লব আনবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের। ফরাসী-বিপ্লব, রুশ-বিপ্লব প্রভৃতি সত্যিকার বিপ্লবের দিকে নজর দিলেই আমরা এটা দেখ্‌তে পাই। রুশো-ভল্টেয়ার, টলস্টয়—টুর্গেনিভ, গর্কি-ডস্টয়ভস্কী চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের আগুন না ছড়ানো পর্যন্ত কর্মে বিপ্লব কেউ আন্‌তে পারেন নি। পাকিস্তানও একটা বিপ্লব, এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? এ দিককার আলোচনা আপনারা সাহিত্য শাখার সুযোগ্য সভাপতির ভাষণে শুন্‌তে পাবেন। আমি শুধু প্রসংগতঃ মুখ্‌তসরভাবে এ বিষয়ে কয়েকটা ব্যাপারের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন। তবু এ-সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ প্রাণপ্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়বস্তুও মুসলমানী নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।

প্রথমতঃ সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ-সাহিত্য হিন্দু মনীষার সৃষ্টি। সুতরাং স্বভাবতই হিন্দু সংস্কৃতিকে বুনিয়াদ করেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন, নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না। হিন্দু-সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মেরই সন্তান। হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুনি-ঋষির ধর্ম। হিন্দুর সংস্কৃতিও তাই ত্যাগ, প্রেম ও ভক্তি-বাদের সংস্কৃতি। এ-সংস্কৃতির বুনিয়াদ প্রতীকপূজা, কাজেই হিন্দুর শিল্পী-মন সুন্দরের পূজারী। এতে করে এই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম-এর সাধনা। সে সাধনার কামনা হচ্ছে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।' সুন্দর ও প্রতীক-পূজারী এই রসিক মন স্বচ্ছন্দে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই মতবাদ প্রচার করেছে। প্রতীক-পূজারী এই রস-পিপাসু মন স্পন্দিত হয়েছে পরকীয়া প্রেমে। আত্মার তসল্লির জন্য, ভক্তিবাদ ও আর্টবাদের মিল ঘটাবার জন্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে। নারী এখানে সৌন্দর্যের প্রতীক, নারী-প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে নারী-মনকে করে তোলা হয়েছে গভীর রহস্য-পুরী। সে দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরীর ঘুমন্ত নারী-প্রেমকে জাগাবার সোনার কাঠির সন্ধানে গোটা তরুণ-বৃদ্ধ জাতীয় মনকে তোলা হয়েছে ক্ষেপিয়ে। ক্রমে শিল্পীর তুলিতে ত্যাগ, বৈরাগ্য ভক্তি-প্রেম প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতির বড় বড় মহান মূল সূত্রগুলিও শিল্পিত হয়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করেই।

ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচুদরের আদর্শ। এই সব আদর্শকে বুনিয়াদ করে, নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু শিল্প-মনীষা যে-সাহিত্য রচনা করেছে, সে সবই হয়েছে উচ্চাংগের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মত, মুসলমান রস-পিপাসুরাও পিপাসা নিবারণ করে।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভক্তি-প্রেম যতই উঁচু দরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দুর ধর্ম যেমন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুনি-ঋষির ধর্ম; মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক-ইন্সাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম। প্রতীকবাদী, সুন্দর পূজারী আর্টবাদী

হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। হক ও ইন্‌সাফবাদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজ-কেন্দ্রিক। মুসলমানের বিচারে তাই আর্ট আর্টের জন্য নয়—আর্ট সমাজের জন্য। এই সমবেত কল্যাণমুখিতার ফলে মুসলমান মূলতঃ কর্মবাদী—ভক্তিবাদী নয়। এইজন্যই মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগের বা বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—দান-দক্ষিণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা হক ও ইন্‌সাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী মুসলমানের নজরে দেবীও নয়, রহস্যপুরীর রাক্ষসীও নয়—সে মানবী। 'বিধবা' ও 'সতী' হিসেবে ত্যাগের মূর্তিমান দেবীরূপে তার যতই পূজা-অর্চনা করা হোক, তার ওয়ারিসী সম্পত্তি এবং দেনমোহরের টাকা আদায় না করা পর্যন্ত তার উপর ন্যায় বিচার করা হল বলে মুসলমান মনে করে না। হক ও ইন্‌সাফের দ্বারা, অধিকার ও সাম্যের দ্বারা, সমাজের অপর সব মেম্বারের মত, নারীরও মন পাওয়া যেতে পারে— অভিসারের ঘোড়ায় চড়ে, 'দেহি পদ পল্লব-মুদারমে'র সোনার কাঠি নিয়ে, তার অন্তরের রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে, কান্নাকাটির বানে রাক্ষস-খুক্ষস মারবার কোনো দরকার করে না। মুসলিম সমাজ মনের রায় এই যে, নিষ্কর্মা, অলস নিদ্রাহীন হতভাগ্য অভিজাতেরাই নারী-হৃদয়কে রহস্যময়' ও নারী-প্রেমকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছে। বড় লোকের অনর্জিত অর্থরাশী ব্যয়ে অবসর প্রচুর জীবন অতিবাহিত করার পক্ষে ইন্‌ডোর খেলা হিসেবে রহস্যপূর্ণ নারী-হৃদয় খুবই চিত্তাকর্ষক। তাছাড়া, তাদের নিষ্ঠাহীন জীবনে নারী-প্রেম সত্যই দুর্লভ বস্তু। তাদের বহুভোগী চপল মনের কাছে নারী-হৃদয় সত্যই রহস্যপুরী। বাংলার মুসলমান অনর্জিত বিত্তশালী অবসর প্রচুর অভিজাত শ্রেণী নয়। কাজেই নারী-প্রেম তাদের দুর্লভও নয়—নারী-মন তাদের কাছে রহস্যপুরীও নয়। এইজন্যই বর্তমান বাংলা সাহিত্য মুসলিম সমাজ মনে কোনো প্রেরণার স্পন্দন জাগাতে পারেনি। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে আনন্দে নৃত্য করতে দেখেও মুসলিম সমাজ মনের একটা তারও ঝনাৎ করে উঠেনি। তাই বিশ্বকবির 'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলের' অত বড় আবেদনেও একটি মুসলমানেরও মাথা এক ইঞ্চি হেঁট হলো না।

তার বদলে বরঞ্চ সেদিন এক অচেনা অজানা বালক হঠাৎ জিকির দিয়ে উঠলো : 'বল বীর, উন্নত মম শির,' সেদিন রিক্ত, ক্লান্ত, ঘুমন্ত ও জীবন্মৃত মুসলমান তছ্নছ্ করে জেগে উঠে চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে হুংকার দিয়ে উঠলো : 'উন্নত মম শির'। কারণ এ-যে তারই অন্তরের ঘুমন্ত শিশুর চীৎকার। এ যে তারই জীবনের কথা। তাই নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব মুসলিম সমাজ-নমকে এমন করে আলোড়িত করতে পেরেছে। মুসলমানের বিবেচনায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার, হাসি-কান্না, তাদের দেবত্ব-পশুত্ব, তাদের মহত্ত্ব-বীরত্ব, তাদের হীনতা-ক্ষদ্রতা, তাদের সংগ্রাম-সাধনা, এ সবই সাহিত্যের বুনিয়াদ এবং নজরুল ইস্লাম এই জীবনকে কন্দ্র করেই সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন। শুধু এই কারণেই নজরুল ইসলাম পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি।

সাহিত্যের স্পিরিট সম্বন্ধে যা বলেছি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্ম-ভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো, তবে সে-সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কীরূপে, আমার ঐতিহ্য, আমার ইতিহাস, আমার ইতিকথা এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে সাহিত্য আমার জীবন-উৎস হবে কেমন করে? রাম-লক্ষণ, ভীম-অর্জুন, সীতা-সাবিত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, মথুরা-অযোধ্যা, উজ্জয়িনী ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুর মনে যে স্মৃতি, কল্পনা ও রস-সৃষ্টি করে, যে আইডিয়া-অব-এসোসিয়েশন জাগায়, মুসলিম মনে কি তা করতে পারে? তেমনি আবার আলী-হাম্জা, সোহ্রাব-রুস্তম, শাহজাহান-আলমগীর, হাজেরা-রহিমা, চাঁদ-রাজিয়া মুসলিম মনে যে-স্মৃতি, কল্পনা ও রস-সৃষ্টি করে বা আইডিয়া-অব-এসোসিয়েশন জাগায়, হিন্দুর মনে তা করতে পারে না। এটা শুধু হিন্দু মুসলিমের কথা নয়। তামাম দুনিয়ার সকল জাতি সম্বন্ধেই একথা সত্য। সব জাতির জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে, ততদিন সে-সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি-আধুনিক নজীর দিচ্ছি।

ইংরাজী সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন শেক্সপীয়র-স্কট-শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অতবড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির

প্রাণে প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফ্‌ট, বার্কলে, গোল্ডস্মিথ ও বার্নার্ডশ'র মত অনেক প্রতিভাবান আইরিশ এই ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য-সেবা হয়েছে লণ্ডনে বসে—আয়র্লণ্ডের মাটিতে নয়। আয়র্লণ্ডবাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোনো স্পন্দন সৃষ্টিও করতে পারেনি। তাই পার্নেল, ড্যাভিট, রেডমণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি--আন্দোলন সফল করতে পারেনি।

অথচ যেদিন আয়র্লণ্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স ইংরাজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরাজী কাল্‌চারের অনুকরণ-মুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ–সাহিত্য-সাধনাকে কেল্‌টিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপ দান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল; নবজন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো; নিজের ভাগ্য-নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে গেল। তার ফল হলো এই যে, আইরিশ জাতির দুই শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা–আন্দোলন ডি. ভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।

আইরিশ জাতির কপালে যা যা ঘটেছে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জাতির কপালেও তাই ঘটেছে এবং সাহিত্যে স্বকীয়তা আনতে পারলে বাকীটুকুও ঘটবে। বাংলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হলে, তার সাহিত্য–সাধনাকে অনুকরণ–অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য দিতে হবে। হিন্দুর সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য খুবই বড়, খুবই জীবন্ত, খুবই উচ্চাংগের। কিন্তু তার নকল করে মুসলমান অমন বড়, অমন জীবন্ত সাহিত্য রচনা করতে পারবে না। হোমার-মিল্টন-শেক্‌স-পীয়রকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ অতবড় সাহিত্য রচনা করতে পারতেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য–সাধনাকে নিজস্ব কৃষ্টির উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন বলেই তিনি আজ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ। বাংলার মুসলমানও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড় হতে পারবে না। তাকে বড় হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিকে বুনিয়াদ করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব–ভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজায় আনন্দময়ী মা এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের

আকাশে ঈদ-মোহার্‌রমের চাঁদ উঠেনি। সে চাঁদ ওঠাবার ভার ছিল নজরুল ইস্‌লামের উপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নাই। কারণ এটা স্বাভাবিক, কাজেই কঠোর সত্য।

তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই? তাকে কি তবে সাহিত্য সাধনার 'ক' 'খ' থেকে শুরু করতে হবে? না, অবস্থা অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই বলে বাঙালী মুসলমানের কোনো সাহিত্যই নেই, একথা ঠিক নয়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর ভিড় নেই বলে মুসলিম সমাজে বিদ্যা-চর্চাই নেই, একথাও ঠিক নয়। বস্তুতঃ বাংলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুথি-সাহিত্য। মাদ্রাসা-মকতবে শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাঠক ঐ পুথি-সাহিত্য থেকেই জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে।

এই পুথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনারা ঐ বিভাগের সভাপতির মুখে অনেক কথা শুন্‌তে পাবেন। আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুথি-সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমারা আবার পুথি-সাহিত্যে ফিরে যাব, সে কথা আমি বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুথি-সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।

এইখানে আমাদের ভাষার কথাও আপনি এসে পড়েছে। ভাষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ থেকে আপনারা ওদিককার কথা শুনবেন। আমি প্রসঙ্গতঃ এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনই যে শুধু বাদ পড়েছে, তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়েছে। মুসলমানের আল্লা-খোদা, রোজা-নামাজ, হজ্জ-জাকাৎ, এবাদৎ-বন্দিগী, ওজু-গোসল, খানা-পানি সমস্তই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ জুলুমবাজীর মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত

হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করবে।

ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। এ সম্পর্কেও আপনারা বিভাগীয় সভাপতির ভাষণে অনেক কথা শুনবেন। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না। এখন বাংলায় ৪৮টা হরফ আছে। এর উপর আছে কার, ফলা ও যুক্তাক্ষর। এটা শুধু শিক্ষা ও সাহিত্যের উপর জুলুম নয়, ছাপা, টাইপ, টেলিগ্রাফ, বেতার প্রভৃতি সকল রকম বিজ্ঞান-বিকাশের দিক থেকেও এই বর্ণবাহুল্য মারাত্মক রকম প্রগতি-বিরোধী। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটীর অন্যতম বড় কাজ এই বর্ণমালা কমানো। রেনেসাঁ সোসাইটীর তরফ থেকে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, তাতে মাত্র কুড়িটি হরফ ও চারিটি হরকত বা কার থাকবে। ফলা ও যুক্তাক্ষর কিছু থাকবে না।

বন্ধুগণ,

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। অতঃপর আমার সহকর্মী বন্ধুগণের ভাষণে রেনেসাঁ সোসাইটীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শুনবেন। তাতে আপনারা দেখবেন, আমরা বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার তাজমহল রচনা করে বসে আছি। হতে পারে এসব আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি-প্রাচুর্য আপনাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। আপনারা যদি আত্মবিশ্বাসী হন, আপনাদের শক্তি-প্রাচুর্য নিয়ে যদি আপনারা রুখে দাঁড়ান, পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণমন যদি কর্মোন্মাদনায় মেতে উঠে, তবে এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে; চার কোটি মুসলমান তাঁদের জীবন-জেহাদে জয়যুক্ত হবে; এই আশা নিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে আদাব আরজ করছি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

[মোহাম্মদী : শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১] আবুল মনসুর আহমদ

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

[১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।]

বন্ধুগণ,

প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করার অধিকার আমার নেই। নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করে এ পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছি অত্যন্ত কুণ্ঠার সংগে। আমি ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ-এর সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটীর মধ্যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে কোন তফাৎ নেই। এ সমিতিদ্বয় প্রথমাবধি পরস্পরের প্রতি যে সৌহার্দ্য প্রদর্শন করে এসেছে, তার নিদর্শন স্বরূপই আমি আজকার আমন্ত্রণকে গ্রহণ করেছি।

রেনেসাঁ সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির নিকট আপনারা হয়তো সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন কিছু শুনবার প্রত্যাশা করেন। নূতন কিছু বলবার বা উপস্থিত সাহিত্যিক মণ্ডলীকে সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করবার মত পাণ্ডিত্য বা অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি যা কিছু বলব তাকে অনেকটা স্বগতোক্তি হিসেবে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সুবিচার করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীদের সাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যের কথা। এ সম্পর্কে এত আলোচনা হয়েছে যে নূতন কোন অভিমত প্রকাশ অসম্ভব। আজ সবাই স্বীকার করেছেন যে, আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যকে এদেশের রাজনৈতিক তথা সমাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভুল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের যে ভাগ্য-বিপর্যয়ের শুরু, এ তারই একটি প্রকাশ মাত্র। এ বিপর্যয় যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা কিছুটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা চলে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের অবস্থা নিরীক্ষণ করে। সাহিত্য চর্চা করতে হলে, অথবা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে বলিষ্ঠচিত্ততার প্রয়োজন, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা

পারম্পর্যের ফলে মুসলমান সমাজে তার বিলুপ্তি ঘটেছিল। রাজনৈতিক পরাজয়ের সংগে সংগে এল নৈরাশ্য-সঞ্জাত মানসিক অবসাদ। তখন মুসলমানেরা পরিবর্তনকে অস্বীকার করে শুধু অতীত গৌরবের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই রইল। এ সর্বনাশকর মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করবার আহ্বান এল স্যার সৈয়দ আহমদের নিকট হতে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদের বাণী প্রচারলাভ করে বিলম্বে। এই বিলম্বের দরুন আমরা আজও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছি। এদিকে বৃটিশ শাসনাধীনে যে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, তা ছিল মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনের সাথে সম্পর্কচ্যুত। সুতরাং ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, জাতীয় ইতিহাস বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ তাঁদের প্রায়ই ঘটত না।

এর ফল হল এই যে, সমাজে স্পষ্ট বিদারণ-রেখা দেখা দিল। এক দিকে পুরাতন পন্থীরা নূতনকে সর্বপ্রকারে পরিহার করে অতীতকে নিয়েই রইলেন। শুধু ইংরাজী নয়, দেশজ ভাষা বাংলার চর্চাকে পর্যন্ত তাঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। অন্যদিকে মুসলমানদের ভিতরে নূতন শিক্ষা বিস্তারের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠতে লাগল, জাতীয় তমদ্দুনের সাথে অগভীর পরিচয়হেতু জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবার মত সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। তখন যাঁরা—তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়—সাহিত্যচর্চা করেছেন, যশস্বী হিন্দু সাহিত্যিকদের পদানুসরণ ব্যতিরেকে তাঁদের আর কোন আদর্শ ছিল না। পরবর্তী যুগের যে দু' একজন সাহিত্যিকের মধ্যে এ পরানুকরণ-প্রবৃত্তির ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে, ইসলামী তমদ্দুনের সাথে তাঁদের পরিচয়ও খুব গভীর নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি নজরুল ইসলাম এবং উর্দু সাহিত্যের হালী বা ইকবালের রচনাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে দেখলে। নজরুলের মর্যাদা লঘু করবার দুরভিসন্ধি আমার নেই বিন্দুমাত্র ; বিশেষতঃ তিনি আজ রোগশয্যায় শায়িত ; তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করা শোভনও নয়। বাংলা কাব্যে ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ তাঁর রচনায় যতটুকু পাই, ততটুকু আর কোথায়ও নয়। কিন্তু তবু সত্য কথা বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে, হালী বা ইকবালের রচনার মধ্যে আগাগোড়া যে সুর শুনতে পাই, তার মর্মে মর্মে ইসলামী তমদ্দুনের রস যেভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তার আভাস নজরুলের

কবিতায় একেবারেই নেই। এর কারণ জাতীয় সংস্কৃতির সাথে যে অগভীর পরিচয়ের কথা পূর্বে বলেছি তা ভিন্ন আর কি হতে পারে, ভেবে পাইনে। নজরুল-কাব্যের ধারা ক্রমশঃ যেদিকে গিয়েছে, তা উপরোক্ত বিশ্বাসকেই সমর্থিত করে।

ইংরেজ প্রবর্তিত নূতন শিক্ষা ব্যবস্থাই যে এজন্য অংশত দায়ী, তা পূর্বেই বলেছি। এ ব্যবস্থার প্রবর্তক যারা, তাদের লক্ষ্যও ছিল এই। মুসলিম সংস্কৃতিকে লঘু করবার চেষ্টা করা হয়েছে সরকারীভাবে। ইংরেজ শাসন মুসলমানেরা সহজভাবে মেনে নিতে রাজি হয়নি, তার শাস্তিস্বরূপই এল এই ব্যবস্থা। মুসলিম শাসনের ইতিহাস নানাপ্রকারে বিকৃত করা হল এবং স্কুল-কলেজে নূতন শিক্ষার্থীরা মধ্যযুগের যে ইতিহাস পাঠ করতো—আজও আমরা সেই ইতিহাসই পাঠ করে আসছি—তাতে শুধু যে অতিরঞ্জন ছিল তা নয়, মুসলিম নৃপতিদের গৌরব ক্ষুণ্ন করবার উদ্দেশ্যে তাতে বহু অলীক কাহিনীও সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। মুসলিম-বিরোধিতা যাতে দেশের শান্তি ব্যাহত না করতে পারে, তজ্জন্য মুসলিম দমন-নীতির সংগে সংগে প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজের উপর নানাপ্রকারের অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকল। মুসলমানেরা ক্রমশই সর্বনাশের শেষ ধাপে নেমে যেতে লাগল।

এর পরিণামস্বরূপই আজ দেখি, যাদের যত্নে ও প্রচেষ্টায় এককালে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্থানলাভ করেছে, পণ্ডিত সমাজের অবহেলা হতে রক্ষা পেয়েছে, বর্তমান যুগে সেই মুসলমান সমাজেরই বাংলা-সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই। কিছুদিন বাংলা সাহিত্যের সাথে আমাদের যোগসূত্রের কথা এমনিভাবে ভুলতে বসেছিলাম যে, আমাদের সাহিত্যের বাহন হবার অধিকারী বাংলা, না, উর্দু, তা নিয়েও আমরা তুমুল বিতর্ক করেছি। সে বিতর্কের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে আজও শুনতে পাই। তাছাড়া প্রতিবেশী সমাজের হাতে এ ভাষার রূপ এমনিভাবে বদলে গেছে যে, এ যে কখনও আমাদেরই নিজস্ব ভাষা হতে পারে, এর উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকতে পারে, বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলো পর্যন্ত এ ভাষায় স্থান পেতে পারে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে এসেছে গভীর সংশয়। একটা জাতির আত্মবিশ্বাস কতদূর কমে গেলে এ রকমের সংশয়

তার মনে উপস্থিত হতে পারে তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তাই দেখি, কায়কোবাদ নবীন বয়সে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি এমন ধরনের বাংলা লিখবেন, যাকে মুসলমানী বাংলা বলে অপাংক্তেয় করে রাখা না যায়। যেন এ ভাষাকে নিজের মত করে গড়ে তুলবার কোন অধিকারই নেই তাঁর।

অত্যন্ত দুঃখের সংগে হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, উপরোক্ত মনোবৃত্তির হাত থেকে আজও আমরা নিস্তার পাইনি। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার পথে এ মনোবৃত্তি প্রধান কণ্টক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই কারণেই তাদের সহজাত প্রতিভা স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারছে না। একটি মুসলমান বালক যে পারিবারিক আবহাওয়ায় লালিত হয়ে উঠে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে তার সমস্তটাই তাকে বিস্মৃত হতে হবে, এই মনোভাব নিয়েই সাধারণতঃ মুসলমান সাহিত্যব্রতিগণ কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এ অস্বাভাবিক ব্যাপার সম্ভব হতে পারে না বলেই কোন মুসলমান সাহিত্যিকের সাহিত্য সাধনাই সার্থকতা লাভ করতে পারছে না। যাঁদের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাঁরা যে আদর্শকে মেনে নিতে পেরেছেন, যে আদর্শ থেকে তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তার সাথে ইসলামী তমদ্দুনের কোন সংগতি নেই, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে তারই প্রাধান্য মুসলমান সাহিত্যিকেরা মেনে চলেছিলেন এবং কেউ কেউ আজও চলেছেন। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যতদিন এ মনোভাব বর্জিত না হচ্ছে ততদিন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুপ্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়ার ফলে মুসলমান সাহিত্যকের সাহিত্য সাধনার পথে যে সমস্ত অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ। কোন জাতি যখন কোন ভাষাকে তার জাতীয় সাহিতের বাহনরূপে ব্যবহার করে, তখন সে নিজের প্রয়োজনানুসারে তাকে ঢালাই করে নিয়ে থাকে। শুধু যে বাংলা দেশেই এ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক ভাষার ব্যাপারেই আমরা এই একই জিনিস লক্ষ্য করে থাকি। হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে যে ভাষা গড়ে উঠেছে, তার সর্বত্রই পাই তাদের জাতির ঐতিহ্যের ছাপ। সংস্কৃত হতে গৃহীত শব্দে, অগণিত বাক্যে, ছড়িয়ে আছে যে-সমস্ত পৌরাণিক ইংগিত,

তার রস গ্রহণ করাই মুসলমানদের পক্ষে দুষ্কর, আয়ত্ত করা দূরেরই কথা। অথচ সেই সাধনাই আমরা করে আসছি। উষাকে উষাদেবী বলে বন্দনা করবার চেষ্টা আমরা করেছি, সূর্যদেবের রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা কবিতা লিখেছি, ইন্দ্রসভার অপ্সরাদের নাম কণ্ঠস্থ করে সঙ্গীত রচনা করেছি, allusion আহরণ করেছি রামায়ণ মহাভারত হতে। allusion আহরণ করাটা মুসলমান সাহিত্যিকের পক্ষে পাপ সে আমি বলছি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অন্য ধরনের allusion ব্যবহার করলে তা সাহিত্যপদ বাচ্যই হবে না—এই যে ধারণা, এ আমাদের পরিত্যাগ করতেই হবে। সংগে সংগে এ কথা বলাও বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, প্রাকৃতিক শক্তি-গুলোকে দেবদেবী কল্পনা করে বন্দনা করা তওহিদভক্ত মুসলমানের পক্ষে অস্বাভাবিকই বটে। ইসলামী ভাবধারাকে অব্যাহত রেখেও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছি নজরুলের কাব্যে। নজরুল ইসলাম আমাদের যে পথের সন্ধান দিয়েছেন সে পথ ধরেই বাংলা ভাষাকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যোপযোগী করে তুলতে হবে। এ সংস্কার অপরিহার্য। কারণ জাতীয় সাহিত্য বলতে যে সাহিত্যের কল্পনা আমরা করে থাকি, তার রূপ হবে বর্তমান সাহিত্য হতে এতই বিভিন্ন যে তার জন্য ভাষায়ও বহু নূতন উপাদানের প্রয়োজন হবে। মুসলিম মানসকে সার্থকভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার মত শব্দ সম্পদ বাংলা ভাষায় বর্তমানে নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ ছাড়াও ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসূচক এমন বহু শব্দ রয়েছে যার বাংলা প্রতিশব্দ বের করবার চেষ্টা ব্যর্থ। সাহিত্যে এ সমস্ত শব্দের প্রবেশাধিকার আছে কি-না এ প্রশ্নের সমাধান করতে প্রতিবেশী সমাজের মতামতের অপেক্ষা করে থাকা হাস্যকর। আর শুধু শব্দের ব্যাপারেই নয়, allusion প্রভৃতির ব্যাপারেও মুসলিম সাহিত্যিক এমন বহু-কিছু আমদানী করতে পারবেন যার পূর্বভাস আমরা আজও পাইনি। মুসলিম সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী; কোনো ভৌগোলিক সংকীর্ণতা বা বাধানিষেধের দ্বারা তার বিকাশ-ক্ষেত্র সংকুচিত করা হয়নি। এ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী প্রত্যেক মুসলমানই। সুতরাং তার দৃষ্টিভংগী সাধারণ হিন্দু সাহিত্যিকের দৃষ্টিভংগীর চাইতে অনেক বেশী মোহমুক্ত ও উদার হতে বাধ্য—তা না বললেও চলে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভিন্নতা,

তা তাদের মানস সংগঠনেও প্রতিফলিত, তাই মুসলিম সাহিত্যিক যদি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাকে অবিকৃত রেখে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান, তবে তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভংগী ও প্রকাশভংগী দুটোই হবে। হিন্দু সাহিত্যকের দৃষ্টিভংগী ও প্রকাশভংগী হতে বিভিন্ন। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে সংস্কারের কথা আমি উপরে বললাম, তার জন্যে মালমসলা বহু কিছু আমাদের গ্রহণ করতে হবে পুথি-সাহিত্য থেকে। কারণ বাঙালী মুসলমানের—বাঙালী মুসলমান আমি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের কথা বলছি না, অর্ধশিক্ষিত এবং অর্থে অশিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভাবছি—বাঙালী মুসলমানের ভাষার যদি কোন প্রামাণ্য দলিল থেকে থাকে তবে তা এই পুথি সাহিত্য। পুথি সাহিত্য সম্বন্ধে এই সম্মেলনেই আলোচনা হবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাইনে। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, এ সাহিত্য আজ যতই অনাদৃত হোক না কেন, এর মূল্য আমরা একদিন উপলব্ধি করব।

পুথি সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রচুর। কিন্তু তবু পুথি-সাহিত্য যে-জগতের দ্বার আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে তার কোন কিছুই অজ্ঞাত, রহস্যাবৃত বা অপরিচিত মনে হয় না। ভাষা তার অমার্জিত হতে পারে; কিন্তু সংস্কৃত ঘেঁষা এবং পৌরাণিক ইংগিতবহুল ভাষার চাইতে সাধারণ মুসলমানের হৃদয়কে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার অনেক অধিক। পুথি-সাহিত্যের ভাষা পুরোপুরি আমরা গ্রহণ করব এ রকমের ওকালতি আমি করছি না। কি এ কথা জোর করে বলা চলে যে, বাঙালী মুসলমান যদি সত্যই এ রকমের সাহিত্য স্থষ্টি করতে চায় যা সমগ্র বাংগালী মুসলমান সমাজ জাতীয় সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারে, তবে সে সাহিত্যের বুনিয়াদ এই পুথির ভাষার উপরেই গড়ে তুলতে হবে। এটা অত্যন্ত আশার কথা, অনেক তরুণ সাহিত্যব্রতীই আজ একথা বুঝতে পেরেছেন।

পুথির যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে, সে হচ্ছে পুথি-রচয়িতাদের জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা। এঁরা জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, তার সমস্তটাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের রচনায়; সংকোচ, দ্বিধা বা জড়তার আভাস কোথাও দেখিনি। এ সংকোচের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত এইজন্য যে, মুসলমান কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজের সমাজ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে লেখবার ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁদের রচনা পড়লে মনে হয় যে, মুসলমানের

সামাজিক বা পারিবারিক জীবন এমনি পঙ্কিলতাময় যে তা সাহিত্যে প্রকাশ করতে যাওয়াই অন্যায়; যেন খুঁটিনাটি সব কিছু প্রকাশ করতে গেলে কলংক রটবে, এর যতটা ঢেকে রাখা যায় ততই মঙ্গল। তাই আমরা দাদাকে ঠাকুর্দা সাজাই, চাচাকে জ্যাঠামশায়ের ছদ্মবেশ পরিয়ে দি, খালা আম্মা মাসিমায় রূপান্তরিত হয়। মুসলমান পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি দিকের আলোচনায় দেখি মুসলমান সাহিত্যিকদের লক্ষ্য, এর মুসলমানী বৈশিষ্ট্যগুলি ঢেকে, আবরণ পরিয়ে রাখবার দিকে। এই কারণেই একমাত্র 'আবদুল্লা' ব্যতিরেকে মুসলিম জীবনের আলেখ্য বাংলা-সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ। জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা—যা পুথির শায়েরদের মধ্যে পাই—শিক্ষিত মুসলমান কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে নেই। কিন্তু জীবনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা যার নেই, সে সেই জীবন সাহিত্যে চিত্রিত করবে কি ভাবে? সার্থক শিল্পীর যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যে প্রেম, যে সহানুভূতি থাকা দরকার, উপরোক্ত মনোভাব নিয়ে মুসলমান কথা সাহিত্যিক কখনও তা অর্জন করতে পারবে না।

আশার কথার চাইতে নিরাশার কথাই এ পর্যন্ত বললাম বেশি। কিন্তু বাঙালী মুসলমান তার জাতীয় আত্মসম্মান সম্বন্ধে ক্রমশ:ই সজাগ হয়ে উঠেছে—তার সূচনা চতুর্দিকেই দেখছি। আজকার এ সম্মেলন তারই অন্যতম প্রমাণ। পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান সাহিত্যিক তাঁর জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সাহিত্যে পরিস্ফুট করে তুলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তরুণ মুসলমান কবি ও লেখদের রচনায় নূতন একটি সুরের আভাস পাচ্ছি। যে মানসিক অবসাদ, যে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব-বশত: তাঁরা পরনির্ভর হয়ে, পরানুকরণ করে আসছিলেন, তা কাটিয়ে তাঁরা উঠছেন বলে মনে হচ্ছে। কয়েকজন নবীন কবির লেখায় যে সবলতা ও স্বস্থতার লক্ষণ দেখেছি তা সত্যই আশাজনক।

জাতীয় সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচয় যতই গভীরতর হবে ততই তাঁরা বহু নূতন সম্পদে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন, এ আশা নির্ভয়ে পোষণ করতে পারি। এঁদের উপরে নজরুলের প্রভাব খুবই বেশি, কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইসলামী আদর্শে রঞ্জিত হলে বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি হতে পারে নজরুলের কাব্য তার আভাস মাত্র, শেষ কথা নয়। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পূর্ব-

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ আত্মসচেতনার যে বাণী বহন করে এনেছে তা অচিরেই সাহিত্যক্ষেত্রে অভিব্যক্তি লাভ করবে, এ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। অন্ধকার কাটিয়ে আজ বাঙালী মুসলমান আলোকের পথে যাত্রা করেছে—এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ করা চলে না। মুসলমান সাহিত্যিকদের এ যাত্রা সার্থক হোক—খোদার দরগাহে এ প্রার্থনা জানিয়ে আজ আপনাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি।

[মোহাম্মদী, শ্রাবণ—ভাদ্র, ১৩৫১] **সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন**

ক বি তা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত

পাকিস্তান, পাকিস্তান, খোশ-আমদেদ্ পাকিস্তান
বাজাও ডংকা, নাহি রে শংকা—ওরে মুসলিম নওজোয়ান ॥
টুটিয়া দীর্ঘ দিনের নিদ্
এসেছে মোদের খুশীর ঈদ
মাশ্‌রেকে আর মাগ্‌রেবে উড়াও আল-হেলাল নিশান ॥

শীতের শেষে এল আবার
গুল-বাগীচায় নও-বাহার
বুলবুল ওই গাহিছে শোন তাজা-ব-তাজা নূতন গান ॥
আবার সবার চোখে চোখে
কাবা'র স্বপন আনিল কে ?

দিকে দিকে জ্বলে লাল-মশাল—ওই জাগে মুসলিম্ জাহান ॥
ওরে মুসলিম চল্ রে জোর
হ'য়েছে যে তোর রাত্রি ভোর
নও-বেলালের কণ্ঠে আজ ওই শোন্ ফজরের আজান ॥

[মোহাম্মদী : চৈত্র, ১৩৫২]   গোলাম মোস্তফা

পাকিস্তানের ভাটিয়ালী সংগীত

ঝির্-ঝির্-ঝির্-ঝির্ পবান বাতাসে ধাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।
পাকিস্তানের পাক-মুলুকে আমায় লৈয়া যাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও॥

সেই না দ্যাশে যাবাব তবে
পরানডা মোর কাইন্দা মরে
খুবসুরৎ সেই দ্যাশের ছবি
আমারে দেখাও—
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও॥

পাকিস্তানের পানে চাইয়া
আমার, চোখ গেলো অন্ধ হইয়া
সেই, পাক মাটিরই সুর্মা
আমার দুই চোখে বুলাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও॥

পাকিস্তানের পিয়াস লাইগা
আমার, দিল্ যে বেড়ায় পানি মাইগা
পাকিস্তানের জম্ জম্-পানি
আমারে পিলাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও॥

পাকিস্তানের রোজ বিহানে
আজান দেয় বুলবুল
হিম-শিশিরে অজু করে
নামাজ পড়ে সব ফুল।

দরিয়া পারে সোনার দ্বীপে
সেই যে পাকিস্তান-শরীফে
আল্লানবীর নামে আজি
দাও রে পাড়ি, দাও—
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও ।।

[মোহাম্মদী : ফাল্গুন, ১৩৫২] গোলাম মোস্তফা

আহ্বান

বঙ্গ-জলধি-আরব-সিন্ধু-ভারত-তীর্থ কূলে
মহা মিলনের মহা সংগমে উল্লাসে আজি দুলে।
পঞ্চ-তটিনী-কল-জয়গানে
পাঞ্জাব ছুটে যুগ-আহ্বানে
দূর সীমান্ত ওজীরিস্তানে
বৈজয়ন্তী দুলে।

মর্মর গিরি ভেদিয়া বাহিনী
জাগে নর্মদা নর্ম-নটিনী
উপল খণ্ডে অতীত কাহিনী
ঝংকারে কূলে-কূলে।

সিন্ধুর মরু মরীচি-মালায়
জাগে জীবন্ত রুদ্র জ্বালায়
বালু বিশালায় বিস্তারি কায়
বিপুল বিথারে ফুলে।

অন্ধ্র-দ্রাবিড় উঁচু করি শির
দূর হোতে দেখে নব লোক-নীড়
বিস্ময়ে তার আঁখি-তারা থির
হোথা কিসের ঝাণ্ডা দুলে।
নব-কলিংগ উৎকল চায়
সিন্ধুর বুকে দূর নীলিমায়
কল-কোলাহল ওই শোনা যায়
তীর্থের উপকূলে।

প্রাচীন মগধ জাহ্নবী—তীরে
বিহারের বুকে চাহিয়াছে ফিরে
অস্ত গরিমা বিম্বিত নীরে।
শ্মশান-ভস্মকূলে।

তখতে তাউস ডাকে ইশারায়
দিল্লীর বুকে গুরু-গরিমায়
যুগের মোগল আয় ফিরে আয়
পুণ্য বেদীর মূলে।

নব-শা-জাহান কে আছিস্ আয়।
নব-তন তাজ কে গড়িবি আয়
কে আলমগীর নব-ফতোয়ার
জাগিবি তীর্থ-কূলে।

আয় আয় ওরে কাল বোয়ে যায়
মহা মিলনের নব-ঈদগায়
ওই শোন্ কেরে ডেকে চোলে যায়
কাণ্ডারী বেদী মূলে।

[মোহাম্মদী : ফাল্গুন, ১৩৫২] শাহাদাৎ হোসেন

নিশান

আধো চাঁদ আঁকা নিশান আমার। নিশান আমার।
তুমি একদিন এনেছিলে বান—জীবন তুফান।
জুলফিকারের, খালেদী বাজুর তুমি সওয়ার
উমরের পথে বিশ্বের দ্বারে হে অম্লান
পার হ'য়ে গেছ বিয়াবান আর খাড়া পাহাড়
সবল হাতের কব্জায় যবে ছিলে সওয়ার।

আজ তুমি হায় লুটছো ধূলায় নিশান আমার।
স্বর্ণ ঈগল্ লুকালো কুলায়ে দু'চোখে তার
পরাজয় ভীতি, (মৃত্যু ঢেকেছে আকাশ কিনার)
ভুলেছে সে আজ পর্বত-চূড়া, অস্ত্র দু'ধার।
তারি সাথে হায় লুটালে ধূলায় আধো চাদ আঁকা
নিশান আমার।

কমজোর বাজু পারে না বইতে ও গুরুভার
সংগ দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার
চারদিকে আজ দেখ্ছে সে তাই মৃত্যু তার।

কার হাতে তুমি সওয়ার হয়েছ আল্‌হেলাল?
আরফাত মাঠ পড়ে আছে ম্লান নাই বেলাল।
তাই বিমর্ষ আকাশ কিনার দিনের মিনার
পারিনা ওড়াতে সেখানে নিশান—নিশান আমার!

অথবা পংগু দুর্বল আজ ঈমান তাই
পরাজিতের এ দুয়ারে জেহাদী নিশান নাই,
আজ পড়ে আছি খেলার পুতুল আজাজিলের
মুমিনের দিল হারায়ে আমরা মৃত দিলের

বোঝা বয়ে যাই ফরমান মেনে প্রবৃত্তির
তাই ক্রমাগত দূরে সরে যায় দিনের তীর...

অন্ধ বধির মৃত্যুর নীড়, আসে শিকল,
শাসনে, শোষণে সারা তনুমন জরা-বিকল।
আজকে তোমাকে ডাক দেই তাই হে অপচল।
হে জুলমাতের সফেদ মুক্তি, চির অটল
তুমি ফিরে এসো আমাদের হাতে। শুভ্র-উষার
সাফা, মারোয়ার তাজা প্রাণ নিয়ে পথিক হেরার
জ্বালায়ে যাও এ মৃত জনপদ সিপাহ্‌সালার
ভেংগে ফেলো এই জগদ্দলে মৃত্যু দুয়ার।

হে নিশান ফের ইংগিত দাও মানবতার,
হে নিশান ফের ইংগিত দাও
মৃত যাত্রীকে পথ চলার,
ইংগিত দাও মানবতার সে
পূর্ণ চাঁদের ভরা—বিকাশ
মানবতাহীন মানুষের বুকে
যেখানে উঠ্‌ছে নাভিশ্বাস,
বঞ্চিত তনু মনের আকাশ
খাক্‌ হ'য়ে যেথা জ্বলে আকাশ
চৈত্র দগ্ধ পোড়া মাটি ম্লান
নিষ্প্রভ নীল শূন্যাকাশ,
সেখ'নে জাগাও সাড়া সুপ্রবল
দাও আহ্বান পথ চলার;
সেখানে তোমার ইশার জানাও মানবতার।
তায়েফের পথে শোনিত স্নানের আমন্ত্রণ,
জেরুজালেমের দুস্তর মাঠ
পাড়ি দিতে করো পরাণ পণ।
নিশান আমার। নিশান আমার।

একী নির্দেশ সীমা-বিলোপ।
সবুজের বন, কেতকীর বন
সেকি শুধু হবে মনসার ঝোপ।
সেখানে কি তুমি জাগবে না আর নিশান আমার ?
সেখানে কি তুমি জেগেছ আবার নিশান আমার ?
আউষ ধানের দেশে বসোরার রং গোলাব
সকল আশার পূর্ণতা নিয়ে মেলবে কলাপ
বন্য ঝড়ের বৈশাখী পাখা নিশান আমার
আধোচাঁদ আঁকা, হায় মেঘে ঢাকা নিশান আমার।
পথে প্রান্তরে লুণ্ঠিত আজ যার জীবন
যে মৃতদলের সম্মুখে ব্যূহে রচে মরণ
তাদের আকাশে জাগালে আজ এ কিসের পণ
বাঁচাতে হবে এ ধূলি—লুণ্ঠিত গণ-জীবন
সবুজ হাওয়ার সমাবর্তনে উজ্জীবন।

এই অতুলন জীবন বাঁচাতে হবে,
পায়রার খোপ ছেড়ে কবুতর ভাস্‌বে আবার নভে,
অনেক দিনের জরা-বিশীর্ণ পায়রা সে
মুক্ত হাওয়ার আস্বাদ হায় পায় না সে,
তার দিতে হবে নতুন হাওয়ার
আস্বাদ আর নব চেতন
পায়রার খোপে মহা বিস্তৃতি
সিন্ধুতীরের উজ্জীবন।

বিরাট আকাশ ভরানো দিল।
উমরের সেই মহান দারাজ
দিগন্ত পারে ছড়ানো দিল।
নিশান আমার কি স্বপন তুমি দেখ্‌ছো আজ
নিশান আমার শীর্ণ মুঠিতে
পেতে চাও তুমি মহা-নিখিল ?

ক্ষুধিত মাটিতে সে নয় তাজমহল,
মানুষের মাঠে বিরান মাটিতে
এবার ফলাবে তাজা ফসল,
এবার নিশান থামবে না তুমি
গড়তে শিলার তাজমহল
এবার তোমার যাত্রা যেখানে
ক্ষুধা বিশীর্ণ অশ্রুজল,
এবার তোমার যাত্রা সে পথে
যেথা উমরের পায়ের ছাপ
জং ধরে যেথা পড়ে আছে হায়
আলির হাতের জুলফিকার।
পিঠে বোঝা নিয়ে ক্ষুধিতের ধারে
চলে একটানা পথ তোমার ;
দেখো সিরাজাম মুনিরা জ্বলছে
মুছে দিতে সব ফাঁকা প্রলাপ......

গুড়ো করে দিতে কুয়াশার ভিতে
ম্লান জড়তার স্থবির গতি
নাস্তিকতার টুটী ছিঁড়ে নিতে
সায়ফুল্লার ঠিক্‌রে জ্যোতি।
যেথা কবন্ধ মৃত জড়বাদ ;
সেখানে জীবন চিরন্তন
নিশান আমার করবে কি ফের
সফেদ নূরের বীজ বপন ?

নিশান আমার। নিশান আমার।
এতদিনে হ'ল সময় তবে ?
আজ কি অন্ধ নফসের সব
জিন্দানখানা ভাঙতে হবে ?
পিছু ঠেলা দিয়ে জড়বাদীদের

দেবে কি আবার বিপুলগতি
আল বোর্জের অচল শিখরে
বহাবে কি প্রাণ স্রোতস্বতী।

নিশান আমার। একদিন তুমি হে দূত উষার
খালেদের হাতে, তারেকের হাতে হয়েছ সওয়ার,
উমর আলীর হাতের নিশান নবীজীর দান
আমাদের কাছে নিশান তোমার শিখা হল ম্লান।
তুমি আনো ফের হেজাজ মাঠের মরু সাইমুম
ভাঙো আঁধারের শিখর, ওড়াও জড়তার ঘুম,
তুমি আনো সাথে মানবতার সে নির্ভীক ঝড়
প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর,
আউষ ধানের দেশে মদীনার সৌরভ ভার
ঝড় বৈশাখে জাগো নির্ভীক, জাগো নিশংক
হেলাল আবার।
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার
নিশান আমার।

[মোহাম্মদী: আশ্বিন, ১৩৫১] ফররুখ আহমদ

তারানা-ই-পাকিস্তান

—আসে নওল পাকিস্তান।

বে-গুনা বন্দী য়ুসুফের কাছে
আজাদীর ফরমান ॥
সব রহস্য হইলো জাহির
শাহী খোয়াবের এইতো তাবীর:
ভূখারীর তরে ফসল জমাও,—
মজ্‌লুমে দাও ত্রাণ ॥

আঁধা-কূপে ফেলা সতেলা ভাইয়েরা
সিজদাগুজার হবে—
আপনার ভুল বুঝিয়া খুলিবে
নয়নের ছানি যবে।
নীলনদী আজ বহাইবে শোকে
জুলিখা তাহার ইয়াকূতী চোখে,
হিংসার শব হবে তার আজ
অশ্রুর ফুল-বান ॥
পাকিস্তান কি তোমাদের?
শুনো গায়িবের সংবাদ:
নবীন কা'বার তওয়াফ-কেন্দ্র—
হাজরুল অ'স্ওয়াদ।
সব কওমের সরদার এসো
নবীর দামন ধরো—
আজাদীর বাইতুল্লার শেষ-পাথর স্থাপন করো।
ভারত-ভাগ্য—নিয়ন্তা তাই
জানাইছে আহ্বান
আসে নওল পাকিস্তান ॥

[মোহাম্মদী: অগ্র:-পৌষ, ১৩৫১] মুফাখ্‌খারুল ইসলাম

কায়েদে আযম

যবে হিন্দের জিন্দানে পড়ে মুসলিম বিল্‌কুল
কালের প্রহরে দেয়না'ক সাড়া,— তিমির-শংকাকুল ;
তামসী রাত্রি, ভুলে গেলো পথ চলিতে নিজের দেশ
মুর্দা-লাশের শিয়রে ঝিমাল ক্ষীণ চেরাগের রেশ,
স্বপ্ন-গহন-ঘুমের নেশায় নিদ পিয়াসীর দল
দিল কাল ঘুম, শুনিল না আর জমানীর কোলাহল ।
শিয়রে কেবল ক্রুর নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস
যুগ যুগ ধরি পলকে পলকে হাসিল মধুর হাস
দুর্যোগ রাতে ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে দ্বারে দ্বারে জমানার
বাজাইয়া গেল প্রলয় বিষাণ, খুলিল না কেহ দ্বার ;
উড়াইয়া নিল পর্ণকুটীর, হর্ম্য পড়িল লুটি,
আশা নিরাশার রঙীন ফুল ঝরিয়া পড়িল ফুটি ;
লুণ্ঠিত বাগে ব্যথার ভ্রমর কাঁদিয়া আকুল প্রাণে
বিদায় লভিল কাল বোশেখীর প্রলয় বীণার গানে ।
নিদ্রামগন বধির শ্রবণে কোন সাড়া পশিল না,
জিন্দেগানীর জিন্দানে তবু জিন্দানী জাগিল না !—

শ্মশানের পরে ফেলে আসা কার, নিয়ে মুর্দার লাশ
নিশীথ গহন শিবার আসরে আনন্দ উল্লাস,
স্থবির ধরায় নিদ্রামহলে শুনি মহা কলরোল
সারা চরাচরে বেদনা বিলায় কামনা—হট্টগোল,
ছিয়াহী রাতের রুষ্ট তিক্ত অভিশপ্তের শাপ
জমানার বুকে মেরে দিল কোন্ বেদনার কালো ছাপ ;
তবুত হলো না চেতনা কাহার, টুটিল না কালঘুম
জমানার ডাক কেঁদে গেলো শুধু নিঝ্‌ঝুম্ নিঝ্‌ঝুম্ !—
ছারে হিন্দের কুল্‌-মুসলিম হল আসা'ব কাহাফ
ঘুমাইল কত শতাব্দী যুগ লভি কার অভিশাপ,
হিসাব মিলে না তার—

কালের ঘড়িতে জমানার কাঁটা ঘুরে গেল কতবার।
দীর্ঘ রজনী গেল কালঘুমে, প্রহরে প্রহরে পাখী—
প্রহর অতীতে ডাকিয়াছে কত আপন কুলায় থাকি'।
অমানিশীথের তিমির গগনে আদম সুরাৎ-তারা
ডুবে গেল তবু দু' আঁখি তাদের হলনা'ক ঘুমহারা।

যামিনীর শেষ প্রহরের পাখী ডাকিল কুলায় হতে
পান্থশালায় জাগিল যাত্রী চলিতে আপন পথে—
গুল মহলায় সুপ্ত কুঁড়ির ভাংগিল না ঘুম ঘোর
দ্বার খুলে চায় আর কত দেরী হাসিতে কনক ভোর।
সুবে কাজিবের ম্লান রওশনী আকাশের পেশানীতে
ছড়াইল রেশ, জাগিল জগৎ বিহগ-কুজন-গীতে।
জাগিল না শুধু এই হিন্দের জিন্দানে জিন্দানী—
যত মজ্‌লুম্‌, ঘুমের আবেশে শুনিল না কান্নাকানি—
পান্থশালায় যাত্রী চলার সাড়া,
নওল উষার আহ্বান শুধু ডেকে গেল দিশাহারা।
হেন মহা'খনে কালের মিনারে শুনিনু আজান ধ্বনি,
ঘুমেলা আঁখির ঘুম নিয়া গেল সেই সুর পরশনী।
চকিতে চম্‌কি বাতায়ন খুলে চাই—
ও কার আজানে শিরীন রাগিণী আজিকে শুনিতে পাই।
হৃদয়-পুলকে বিস্ময়ে আরো ভরে আসে সারা বুক
কুল-মুসলিম ঘুমেলা নয়ন খুলি চাহে উৎসুক...
এ কোন্ দরদী ক্লান্ত আঁখির ভাঙালো সে বিভ্রম,
বিস্ময়ে শুনি উঠে শোরগোল এ যে কায়েদে আযম—
কুল-মুসলিম-শরন-দরদী-দীল
ঘুমন্তপুরে খুলে দিল আজ রুদ্ধ দ্বারের খিল।

তিমির রাতের বন্ধুর পথ চরণে দলিত করি
নওজমানার রাঙা উষার রোশ্‌নী খাঞ্চাভরি
আনিয়াছ তুমি শবেকদরের বেহেশ্‌তী সওগাত,
বন্দেগী তাই করেছিলে বুঝি জেগে জেগে সারা রাত।

নেকীর বদলা, চেয়েছিলে তুমি খোদ-কওমের দিল,
করে দাও খোদা মুক্ত আজাদ খুলে দাও দ্বার খিল।
দস্ত উঠায়ে দরবারে পাক করিয়াছ মোনাজাত
—'রোশ্‌নি পরশে তব, জমানার ছিয়াহী গহন রাত
জৌলুসে আলা কনক-প্রভাত দাও জাগাইয়া দাও
তব হাবিবের উম্মতে আজ নয়ন তুলিয়া চাও।'
ব্যর্থ হয়নি তব এই ফরিয়াদ,
আর্শ থাকিয়া প্রিয় বান্দারে রব্বে করিলা ইয়াদ।
যদিও সতত জাগে তার আঁখি বিশ্ব-মানব পরে
মোমিনের ডাক আলাহেদা হয়ে বাজে তার অন্তরে ;
অমনি তাঁহার চশ্‌মে-রহম খুলি'
চাহে বান্দায়, মাফি দেয় যত সঞ্চিত 'বদী' গুলি।
সেই দুর্যোগে সুযোগের আলো তোমারে দেখালো পথ
দুস্তর রাহে টেনে নিতে কুল-মুসলিম-মনোরথ।
ব্যর্থ হল না তোমারি সে ডাক—সেই মহা আহ্বান
তিমির রাতের অবসানে আজ শুনিলাম সে আজান
নওজমানার হে মহা মোয়াজ্জিন
ধন্য তোমার সুরের পরশ ধন্য করেছে দিন!

ধন্য মানব-আহ্বান যাঁর ধন্য করিল ধরা,
হে মহামানব ধন্য তুমি হে, বিজয়-মুকুট পরা।
সার্থক ডাক ডাকিয়াছ তুমি কণ্ঠে ভরিয়া সুর,
বীণার রাগিণী ম্লান হয়ে হলো—দুর্যোগ শোকাতুর।
দুখের ছাওয়াল আম্মার ক্রোড়ে জাগিল তোমার ডাকে
হল নাকি শেষ দীরঘ যামিনী অমনি শুধায় মাকে,
বালিকা বধুর নিদ ভোলা আঁখি টুটিল নিঁদের মায়া
শয্যা ত্যজিয়া বাতায়নে চায় ঝাড়িয়া অলস কায়া

নামাজীর দেলে খোদায়ী তাকিদ ডাক দিল ফজরের,
সুপ্ত কো'মের অন্তরে জাগে রওশনী স্যাদিকের ;

কাতারে কাতারে মমিন মুসলমান—
তোমার জমাতে হইল শামিল শুনি মহা আহ্বান।
ধ্বনিত তোমার কণ্ঠ মধুর--'আল্লাহো আকবর',
তাওহিদ গানে জয় করি নিল নিখিলের অন্তর।
ছিয়াহী গোমড়া জিন্দেগানীর দ্বারে হানি পদাঘাত
লৌহ প্রাচীর ধসি দিলা সব হয়ে গেল ধূলিসাৎ,
সশস্ত্র কত শান্ত্রী সেপাহী রুধিতে নারিলা গতি,
জিন্দানীকুল মুক্তি আলোকে লভিলা আজাদী মতি ;
সাম্যের গানে সুন্দর হল নিখিল মোমেন দিল
জিন্দেগানীর রঙিন খ্বাব--কল্পনা ঝিল্‌মিল্
বাস্তবে পেল রূপ--বড় সুন্দর,—
তোমার পতাকা তলে দাঁড়াইল—আশাভরা অন্তর।
তোমারি 'বায়েৎ' করিল গ্রহণ কওমে তামাম লোক
নওজামানার সিরে আফ্‌তাব ছড়াল মুক্তিলোক ?
কোটী কোটী কত মোমিন দলের বেদনার রোনাজারী,
সাস্ত্বনে তব রূপ নিয়া হল খুশীর নহর-জারী।

নওজামানার মুকুট বিহীন হে মহা শাহান শাহ্
হাবিবে খোদার উম্মৎ তুমি মোমেন খয়ের খা।
সোনার তখ্‌তে বসোনি'ক তুমি, হৃদয়ে পাওনি লাজ
মনের তখ্‌তে বসিয়াছ তুমি হৃদয়ের মহারাজ!
মানুষের তরে আজাদী মাগিয়া খোদ্‌কে তুচছ করি
ওহে মোজাহেদ, জেহাদ ঘোষিছ নাশিতে ন্যায়ের অরি।
নওজামানার তুমি সম্রাট সে সালাহ্‌উদ্দীন,
আরবার বুঝি এলে ভিন বেশে বাঁচাতে নবীর দ্বীন !

নওজামানার ইসলামী জোশে আসিয়াছ বুক ভরি
হায়দরী হাঁক কণ্ঠে পূরিয়া খালেদের অসি ধরি,
ওমর হইতে লভিয়াছ দান,—তেমতি দারাজ দিল
ওসমান সম মালখানা ঘরে খুলিয়া দিয়াছ খিল,

হুসেনের মত কলিজার খুন, বিলাইতে অকাতরে
ইসমাইলের কোরবান বুঝি আনিয়াছ সাথে করে।
শত সীমারের ভয়াল ভ্রূকুটি—উলংগ-খঞ্জর
সের পরিতব; ভ্রূক্ষেপ নাহি-—নাহি দিলে ত্রাস ডর।
দুর্বার বেগে পদতলে দলি শত সীমারের শির
বিজয় মুকুট লভিয়াছ তুমি সেপাহ্‌সালার বীর!
তুমি—লওহে সালাম লও,
জিন্দেগানীর দারাজি লভিয়া তুমি রও জীতা রও
তোমারি প্রিয় হিন্দের কুল্ মজ্‌লুম্ মুসলিম
তোমার চরণে ভেজে নিশিদিন লাখো কোটী তসলিম।

[মোহাম্মদী : কার্তিক, ১৩৫১] মোহাম্মদ রওশন ইজদানী

রাজে-পাকিস্তান

ওরে আয়, ফিরে আয়!
পশ্চাতে তোর রাহা-বরদার মুর্শিদ ডেকে যায়।
গোরস্তানের যাত্রী সহসা চম্‌কিয়ে চাহে ফিরে,
ওরে আজ তারা এসে যে পড়েছে মৃত্যু-সাগর-তীরে।
পথ-ভুল-করা মরণ-পথিকে তাই কে ডাকিয়া যায়—
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

ভাইয়ের কণ্ঠ বাঁধ আজি তোর নবীন ভ্রাতৃপ্রেমে;
আস্‌মান ভেংগে খোদার রহম মাথায় পড়ুক নেমে।
সাবধান! ওই দুশমন তোর পিছন নিয়েছে ভাই!
মন ভুলাইছে মুনাফিকদের প্রণয়ের আশ্‌ নাই।
বহুবার খোদা রক্ষা করেছে বিপন্ন ইস্‌লামে.
মুনাফিকদের চোরা মা'র হ'তে সাবধানী ইল্‌হামে।
ইল্‌হাম আজো ফিরে দ্বারে দ্বারে 'হুশিয়ার'-হিক্‌মতে;
কানে তুলো দিয়ে থাকিস্‌নে তুই শয়তানী হরকতে!

ফিরে আয়, ফিরে আয়!
ওরে, পথ ভোলা! কে যেন ডাকিছে ফিরে যেতে কাফেলায়
একা একা তুই যাস্‌নে ও-পথে, দস্যু-কবলে প'ড়ে
পথ-মঞ্জীলে জান যাবে তোর গন্তব্যের তরে।
দুশ্‌মন তোর পিছন নিয়েছে সম্মুখে মরীচিকা,
অট্টহাস্যে নৃত্য করিছে জ্বালিয়ে বেদন-শিখা।
তার চেয়ে ভালো, ভাই সনে ভাই এক প্রাণ এক দিল;
সম্ভ্রমে তোরে সালাম জানাবে মরুপথ-মঞ্জীল।

ওরে আয়, ফিরে আয়!
(ওই) আল্লা যে ডাকে, রসুল ডাকিছে, ইস্‌লাম ডেকে যায়।
আল্লা'র রশি মজ্‌বুৎ করে ধর এক-বন্ধনে,
দিল-দেহ তোর চর্চিত কর তাউহীদ-চন্দনে!
আরব-সাগর হিন্দোলে এসে ভারত-সাগর বুকে
মুস্‌লিম-হিন্দ্‌ মেতে ওঠে আজ আজাদীর উৎসুকে।
উচ্ছ্বসি' ওঠে মরুর পাষাণ ফেটে আব্‌-জম্‌জম্‌
শীতের মুর্‌দা বৃক্ষ-শাখায় 'নওমেজ' উদ্‌গম!
মৃত্যু মথিয়া অমৃত ওঠে আজিকে জীবন-স্রোতে;
কাফন ফেলিয়া সাজ, সাজ ওরে নবীন চলার ব্রতে।
নতুন রাহায় প্রাণ-স্রোতে মাতি, হামরাহী ডেকে যায়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

নিদ্রা-নিঝুম বন্ধ-দুয়ারে ঝংকারি জিঞ্জীর,
মৃত্যুর দেশে জাগরণী গায় কোন্‌ সে জীবন-বীর!
'কুম্‌-বে-য়েজ্‌নী-জেগে ওঠ্‌!' কেগো, হুংকারে গোর' পরে;
কবরের বুকে জীবন গজায় নবীন বীর্যভরে।
তূর্য-নকীব গুর্জ হানিয়া ভাংগিল নিদ্রাপরী;
মায়ার স্বপন মিস্‌মার হলো, বহিল ভগ্ন-নুড়ি।
নিদ্রা-বিভল চম্‌কিয়ের চায় বিশ্বের চারিদিকে,
ভুবন ভরিয়া জীবন-জোয়ার উঠিয়াছে দিকে-দিকে।
তারি এক মহা-ঊর্মি আসিয়া ভাংগিল ঘুমের ঘোর,
সেই ঊর্মির নির্দেশ মত আসিল নবীন ভোর।
নূতন জোয়ার কল-কল রোলে ইশারায় ডেকে যায়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

ফিরে আয়, ফিরে আয়!
মৃত্যুর বাঁধা পশ্বল ভাংগে জীবনের বন্যায়;
সুবি'-সাদিকের আলোর নিশানী দিগ্বলয়ের শিরে
সফেদ বকুল কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিছে ধীরে।
পূবের আকাশে রঙের দোলন এই বুঝি লাগে-লাগে;

আর দেরী নাই, রাঙিবে হৃদয় বাঞ্ছিত-অনুরাগে।
চক্রবালের আলোর মিনারে উষার মুয়াজ্জিন—
আজান হাঁকিবে; এখনি পুলকে ডাকিয়া আনিবে দিন!
অজু ক'রে সব প্রস্তুত হয়ে প্রভাত-প্রতীক্ষায়
বসে রও, ভাই, ইকামৎ বুঝি এখনই শুনা যায়!
নও-ফজরের জামাত-শামিল হইবি নাকি রে আয়,
জামাত-নামাজে অধিক সওয়াব আমলেতে লেখা যায়,—
ওরে আয়, ফিরে আয়;

ভেবে দেখ্ তুই কি ছিলি কি হ'লি; সেই দিনে পুনরায়
ফিরে আন্, ফিরে আয়।

'আমি মুস্‌লিম।' বল্ বল্ তুই,—'ওরে আমি মুসলিম:
দুই হাতে ধরা বহিতো আমার নজ্‌রানা-তস্‌লীম।
আমি মুস্‌লিম, পাথর বাঁধিয়া উদরে ক্ষুধার জ্বালা
জিহাদের নামে ছুটিয়া গিয়াছি, জিনেছি বিজয়-মালা।
আমি মুস্‌লিম, নাসারা হাজার পঞ্চাশ সেনা সনে
পাঁচ শত নিয়ে সংগ্রাম জিনি' দেমাক হয়নি মনে।
আমি মুস্‌লিম পূজার অগ্নি মোর তেজে নিষ্প্রভ;
আমি মুস্‌লিম, মোর 'ওয়াতান' জুড়িয়া নিখিল ভব।
আমি মুস্‌লিম, মরু-সাইমুম শান্ত হইয়া ভয়ে
আমার ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলেছে বিশ্ব-ভুবনে বয়ে।
আমি মুস্‌লিম, মোর তরে দেখো, দোলে ছায়া অভিরাম,
নীরস বালুকা চিপে রস করি' খর্জুর ভরে 'যাম'।
আমি মুস্‌লিম, যমের মতন ভয় করিয়াছে যমে;
মশ্‌রিক হতে মগ্‌রিব-তক কাঁপায়েছি বিক্রমে।
আমি মুস্‌লিম, কেঁপেছে জালিম, জন-পেষা অধিরাজ;
নির্জিত সেই উদ্ধত খুন উচছ্বসি' ওঠে আজ।
আমি মুসলিম, পলায়ন-পথে জাহাজ ডুবিয়ে ঘাটে,
জয় বা মৃত্যু দুই নিয়ে জিনি হিস্পানী-সম্রাটে।

আমি মুস্‌লিম, অশ্ব ছুটিয়ে সাগর উর্মি-ঘাতে
বলেছি, "আল্লা, দেশ নাই আর দ্বিন প্রচারিব যাতে।"
আমি মুস্‌লিম তরুণ বয়সে হিন্দের দ্বারে এসে
দাঁড়ায়েছিলাম ভাস্কর-সম নও-বিজয়ীর বেশে।
আমি মুস্‌লিম, সতেরো ফউজে বংগ করিয়া জয়,
বিশ্ব ভূবনে নাম করিয়াছি দুর্লভ—অক্ষয়।
আমি মুস্‌লিম, যেথায় দেখেছি 'সুন্দর' অবিচার,
ধ্বংস করিয়া বসায়েছি সেথা কুসুমের বিস্তার।
আমি মুসলিম, উন্নত করি সৃজনের আশরাফ—
মানুষের শির;—পাপ-গ্লানি সব ধুইয়া করেছি সাফ্।
আমি মুসলিম!' বল্‌বল্ হেকে, চল সেই তরীকায়;
ওরে আয় ফিরে আয়।

[মোহাম্মদী : মাঘ, ১৩৪৯] মোফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম

হাজার বছর পার হয়ে

হাজার বছর পার হ'য়ে ফের ডাক দিল তোরে পাকিস্তান।
চারদিকে যবে মৃত্যুর ঘের, উড়িল তখন লাল নিশান।।
জনগণ যবে মরে ক্ষুধাতুর, বান বয়ে যায় লোহু অশ্রুর,
ফেলে বেড়াজাল চারদিকে বেড় বারুদে যখন কালো বিমান।।

এমন সময় ডাক এল তার' হাঁক দিল দ্বারে পাকিস্তান:
আনো মোজাহেদ সেনা হাতিয়ার, সাথে এসো বীর নওজোয়ান:
উমরের পথে বোঝা বহিবার, দাওয়াত এসেছে আজিকে তোমার
খালেদী বাজুর তল্‌ওয়ার নিয়ে খুলতে হবে এ নভো—খিলান।।

সময় এসেছে, সময় এসেছে ভাংগিতে কলুষ এ জিন্দান,
আজ পিছে যারা রহিবে তাহারা রবে চিরদিনই না-ফরমান।
পূব-পশ্চিম দুই দিক থেকে পিশাচের দল ফেলিয়াছে ঢেকে
তোমার কণ্ঠ টিপে ধ'রে আজ রুদ্ধ করিতে চায় আজান।।

নব চেতনার বিষাণ বাজায়ে ডাকিছে তোমারে পাক কোরান,
ডাকে খোলাফায়ে রাশেদীন যেথা গণতন্ত্রের মাঠ বিরান।
সে বিরান মাঠ আজিকে ভরাতে, কোরানের জ্যোতি নিয়ে এসো সাথে
আনো সাথে করি, বিজয়ী দামামা, আনো মোজাহেদী ঝড় তুফান।

আর এক পাও দূরে মঞ্জিল! এখনি হোয়ো না শ্রান্তপদ।
জানো নাকি আজ তোমার দুয়ারে বহে ক্ষুধিতের শোনিত-নদ?
জানো নাকি আজ তোমার ঘরের প্রতিকোণে কারা ফেলিয়াছে ঘের
তোমার যাত্রা-প্রতিবন্ধক শয়তান দল পথে শয়ান।।

প্রবল লাথিতে উড়ায়ে এসো সে বাধার পাহাড় জগদ্দল,
নুড়ির মতন উড়ুক পাহাড়—শক্র পাহারা শিলা অটল,

তব সংগিনে হে দুর্নিবার। ভাঙ্গুক সকল দুর্গের দ্বার
রংগিন হ'য়ে আনুক পাপড়ি বিরান ভিটাতে গোলাবি গান॥
আজ এতদিনে হয়েছে সময় থাক্‌বে না কেউ না-ফরমান।
শোনো পথে পথে নতুন দিনের মোজাহেদ দল দেয় আজান,
আসে ক্ষুধাতুর, আসে গৃহহীন, আসিছে সবুজ, দরদী প্রবীণ
ক্ষুধা-সাহারায় ঝরায়ে ফোয়ারা আনিছে তাহারা ফুলের বান॥

ওরে মোজাহেদ, হও আগুয়ান, ছুটেছে লোহুর আগুন, তুফান,
আর এক পাও দূরে মঞ্জিল, জীবন যেখানে অনির্বাণ॥

[মোহাম্মদী : ভাদ্র, ১৩৫০] ফররুখ আহ্‌মদ

নতুন দিনের বন্দনা

শতাব্দীর কত মৃত কাল-সিয়া রাত—
আঁধারের তিমির প্রপাত
এল নিঃশেষ হয়ে,
পলাতকা রজনীর আদম সুরাত
হয়ে আসে নিমীলিত ক্ষয়ে...
রাতের শিশির শুকে যায় আজি
তৃণে-শস্যে ফলে,
রঙিন্ দিনের স্বপ্নে—ধরণীর স্মৃতি পত্র তলে
আঁধারের যবনিকা ঝলে...
আজ রাতের বিদায়
খেয়ালীর রাংগা দিনের আগমনী গায়...

নতুন দিনের গান—
ধরণীর মিনারে মিনারে
ধ্বনিছে বেলালী-কণ্ঠে ভোরের আজান।
পুরাণের ধ্বংস নেশা অতীতেরে আজ
নিষ্পেশিয়া নিষ্ঠুর সংঘাতে
নতুনের ভিত্তি ভূমি করিছে আজাদ
বিজয়ের ডম্বরু নিনাদে ;
অনাগত নতুনের রংগিন্ হাসীর হাসীন ভোর—
নতুন দিনের মানুষের দিলে দিলে
খোলে দি'ছে সুপ্ত যতো আলোকের দোর।
হে আজাদী রঙিন দিন
তোমারে আজিকে সালাম সালাম জানায়
নিখিল মুসলেমিন!

শতাব্দীর ব্যথা-মৃত রুহে-ইনসান
আজি খাবে-মশ্‌গুল পাষাণ কবরে
খোশ্‌-আমদেদ্‌ জাগে আল-হিলালী নিশান
দূর নীল ঘন অম্বরে,
নয়ালী ভোরের বায়
তা'রি জয় নিশানের পত্‌পত্‌ ধ্বনি শোনা যায়..

জাহেলিয়াতের শাদ্দাদী তস্‌বির্‌-নকল ভেস্তখানা
আজি ত্রাস কম্পিত থরে থরে—
কাঁপে লাখো নমরুদ-ফেরাউন-মনা
ব্যর্থতার গহীন গহ্বরে ;
ধসে যাবে আজি যত কুফ্‌রান-খানা,
খোদাই রহ্‌মতে আজ নেমে এল কুফারের
জুলমাৎ-খানা ।
হে নওজমানা—পুণ্য উজালা দিন
তোমারে সালাম—সালাম জানায় আজ
নিখিল মুসলেমিন ।

[মোহাম্মদী : আষাঢ়, ১৩৫৪] **মোহাম্মদ রওশন ইজদানী**

গান

ফিরিবে আবার পাকিস্তানের
পাক ইস্‌লামী সুল্‌তানাৎ।
ফিরদৌস হ'তে নামিবে প্রভাত
টুটিয়া ধরার আঁধারি রাত॥
জিন্দেগী সেথা পাক হবে ফের
দুঃখের রোজা হবে কাবার।
নূতন চাঁদের ঝাণ্ডা উড়ায়ে
জাগিবে নিশানে নূতন চাঁদ॥
আজাদ হবে গো মুসলিম দিল সে দেশে ফের,
টুটিবে আবার জিঞ্জির তার দুই হাতের।
একহাত তার রবে খেদমতে মজ্‌লুমে
জালিমের তরে দোস্‌রা হাত॥
আনিল উমর আলী হায়দার যে ইস্‌লাম,
জমাতের তরে যুগে যুগে কত
আনিল জিন্দা দিল ইমাম—
আবাদ হবেগো সেই ইস্‌লাম, সে সংসার
মানুষের ঘরে ফুটিবে ভেস্‌তীগুল আবার;
মরু জামানার পিয়াসা-কাতর দিল সবার
লভিবে শীতল আবহায়াত॥

[মোহাম্মদী: আষাঢ়, ১৩৫৪]

তালিম হোসেন